KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫/- ৫/- ৫/-	Year of Publication : পৌষ, ১৩৬৪ ফাল্গুন, ১৩৬৪ চৈত্র, ১৩৬৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 January '59 (0.50) SAMAKALIN

★ ARUNA ★

ARUNA MILLS
MARINA

more DURABLE
more STYLISH

SPECIALITIES

Sanforized :
Poplins
Shirtings
Check Shirtings
SAREES
DHOTIES
LONG CLOTH

Printed :
Voils
Lawns Etc.

in Exquisite Patterns

ARUNA
MILLS LTD.
AHMEDABAD

★ ARUNA ★

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৬ষ্ঠ বর্ষ

ফাল্গুন ॥ ১৩৬৫

= সম্পাদক =

= আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

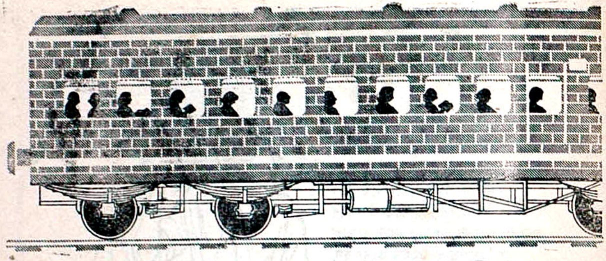

রেলের কামরাগুলো ত' ইটের তৈরী নয়!

রেল কামরার ভেতরটা কাঠের তৈরী, বসবার আসনগুলো রেক্সিনে ঢাকা। এ দুটো সহজেই আগুনে পুড়ে যেতে পারে। সেই জন্যেই রেল কামরায় যাতে হঠাৎ আগুন লেগে দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্যে সব রকম সতর্কতা অবশ্যই দরকার।

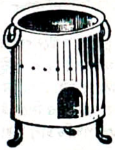

কখনও জানলার কাছে, হাতলের ওপরে বা স্নানের ঘরের তাক-এ জলন্ত সিগারেট রাখবেন না। ছাইদানি থাকলে সেইটাই ব্যবহার করবেন।

কখনও রেল কামরার ভিতরে রান্নার জন্যে উনুন বা স্টোভ ব্যবহার করবেন না। গাড়ীর ঝাঁকুনি বা দমকা বাতাসে সহজেই আগুন লাগতে পারে।

কখনও কামরার মধ্যে জলন্ত সিগারেট বা দেশলাই কাঠি ফেলবেন না। ছুঁড়ে ফেলবার আগে সেটা নিভিয়ে ফেলুন।

কখনও নিজের মালপত্রের সঙ্গে বিস্ফোরক, দাহ্য পদার্থ বা রাসায়নিক সামগ্রী বহন করবেন না।

পূর্ব রেলওয়ে

EVEREST ER-58-6 A-BEN

সমকালীন

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ ফাল্গুন ॥ ১৩৬৫

সূচীপত্র

প্রবন্ধ ॥ মাধব কন্দলীর রামায়ণ। সোমেন বসু ৬৫১
দ্রষ্টা জগদীশচন্দ্র। সনৎকুমার রায় চৌধুরী ৬৫৭
যতীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবন জিজ্ঞাসা। ভবানীগোপাল সান্যাল ৬৬০
উপন্যাস ॥ এক ছিল কন্যা। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৭১
কবিতা ॥ দ্বীপান্তর। বিনয় হাজরা ৬৭৯
ঝরণা বেগম। সামসুল হক ৬৮০
অনুস্মৃতি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৬৮১
আলোচনা ॥ সম্যক। শঙ্কর গুপ্ত ৬৮৫
মোহিতলালের ছন্দ। প্রফুল্লকুমার দত্ত। ৬৮৮
সমালোচনা ॥ নিরঞ্জন হালদার ৬৯৪

সম্পাদক

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার
হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

বৈদিক যুগ থেকে

"तंतुं तन्वन्, रजसो भानुमन्विहि,
ज्योतिष्मतः
पथो रक्ष धिया कृतान् ॥
अनुल्बणं वयत,
जोगुवामपो, मनुर्भव, . . ."

ऋग्वेद

সূর্য্যকরের উজ্জ্বলতা প্রকাশ পায়
এমনভাবে সুতো কাটতে হবে,
সুতোতে থাকবেনা কোন গ্রন্থি।
অভিজ্ঞতা সঞ্জাত প্রণালী থেকে
বিচ্যুত হয়োনা।
কল্পনার দ্বার উন্মুক্ত করে দাও।
বস্ত্রবয়ন, কবিতা রচনারই মতো—
—ঋগ্বেদ

সৌন্দর্য্য থাকে
হাতের তাঁতের
বুনানীতেই

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড
শাহীবাগ হাউস, উইটেট রোড, বোম্বাই

DA-58/414

মাধব কন্দলীর রামায়ণ

সোমেন বসু

পূর্বভারতীয় লোকভাষায় যাঁরা রামায়ণ রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন কৃত্তিবাস ও মাধবকন্দলী। বাংলা আসামের ঘরে ঘরে ঐ দুই কবির কাব্য পঠিত হচ্ছে ও হয়েছে—বাংলায় কৃত্তিবাস এবং আসামে মাধবকন্দলী। মণিপুরের পশ্চিমে আর জয়ন্তীয়া পর্বতমালার পূর্বে কাছাড় দেশ অবস্থিত। ঐতিহাসিকেরা কাছাড়ীদের প্রাচীনতম আদিবাসীদের মধ্যেই ধরেছেন। গোয়ালপাড়া ও উত্তরবঙ্গের মেচ জাতির তারা সমগোত্রীয়। সংস্কৃতে কাছাড় কথার অর্থ 'প্রান্তীয় অঞ্চল'—ব্রহ্মপুত্র ও কোশী নদীর পর্বতসন্নিহিত উপত্যকাকে নেপালীরা কাছাড় বলে। কাছাড়ের খুব প্রামাণ্য কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। অন্যান্য জাতির সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের ইতিহাস থেকে, কবিদের কাব্য থেকে কিছু কিছু ইতিহাস খাড়া করার চেষ্টা হয়েছে, তবে তা যথেষ্ট নয়। কাছাড়ের ইতিহাসের যে অংশটুকু পাওয়া যাচ্ছে তার অধিকাংশই আহোমদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের বর্ণনা। আহোম শক্তি যত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, কাছাড়ের সীমানা ততই সংকীর্ণ থেকে সংকীর্ণতর হয়েছে। কাছাড়ের অধিপতিরা কখনো কুচবিহারের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কখনও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন কচ্ছেন আহোমের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষ বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে।

কথিত আছে দরং-এর বরাহী রাজার বোড়ো মন্ত্রী বিরোচন, রাজার কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। কিন্তু রাজার সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণতীরে বর্তমান নওগাঁ জেলায় নতুন রাজ্য স্থাপন করলেন। তাঁর রাজধানী হলো ব্রহ্মপুর আর তিনি নিজে নাম দিলেন বিচারপতি ফা। এখনও বরমপুর নামে একটি জায়গায় কিছু কিছু ঘরবাড়ীর ভগ্নচিহ্ন পাওয়া যায়। তাঁর পুত্র বিক্রমাদিত্য ফা উত্তরপূর্বে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন এবং দুর্গার স্বর্ণমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে সে রাজধানীর নাম দিলেন সোনাপুর। নাগা দলপতিদের এক বিরাট অভ্যুত্থান তিনি বলিষ্ঠতার সঙ্গে দমন করেছিলেন। ধানসিড়ি নদীর তীরে এই বিদ্রোহ দমনের চিহ্নস্বরূপ কাচোমারি সহর গড়ে তুললেন। বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করে আর একটি সহর গড়লেন তার নাম লখিন্দরপুর। তারই কাছাড়ী নাম ডিমাপুর। দেখা যাচ্ছে রাজাদের নাম করণে. সহরের নামকরণে হিন্দুয়ানীর প্রভাব বেশ ভাল রকমই পড়েছিল। বিজয়তোরণ কয়েকটি করা

হয় বিদ্রোহ দমনের চিহ্নস্বরূপ। সে বিজয়তোরণগুলি ইঁটের। ইঁটের ব্যবহার প্রমাণ কর্চ্ছে যে তখন থেকেই বাংলার সঙ্গে কাছাড়ের যোগযোগ খুব গভীর—

"It was evidently from Bengal that they got their ideas of building with bricks, for in those far off days neither of the other nations built permanent towns of fort........the remains at Dimapore which flourished centuries before the Ahoms arrived, show us the Kacharis knew all about the art of brick making and permanent buildings; while the style in which they worked points to having been copied from Bengal, the nearest civilised country to them. (History of Upper Assam. Shakespeare, P. 13-14). বরাহরাজার মন্ত্রী থেকেই এই বংশের সূত্রপাত বলে এদের বোধহয় বরাহরাজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাধবকন্দলী কাছাড়ের কবি এই ধারণা বহুকাল ধরে চলে আসছে। এই ধারণার বিপক্ষে যাবার যেমন কোন বড় যুক্তি নেই তেমনি তিনি যে কাছাড়েরই, অন্য কোন স্থানের নন একথা জোর করে বলাও খুব বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তেমনি মাধবকন্দলী কোন সময়ের লোক সে সম্পর্কেও তর্ক আছে। অসমীয়া সাহিত্যসেবীরা মাধবকন্দলীকে কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী বলে প্রমাণ করার তাড়ায় কখনো চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ায় কখনও চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে তাঁকে টানাটানি করে নিয়ে বেড়াচ্ছেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে মহামণি বা মহামাণিক্য নামে কোন রাজা কাছাড় বা ত্রিপুরা বা অন্য কোন অঞ্চলে নেই। মাধবকন্দলীর অসম্পূর্ণ রামায়ণ শংকরদেব সমাপ্ত করেছিলেন, এই অজুহাতে তাঁর সময় শংকরদেবের চেয়ে শখানেক বছর এগিয়ে নিয়ে যাবার প্রবণতাই এই অবৈজ্ঞানিক ধারণার মূলে। আসামের ধর্মগুরু ভাবনায়ক শংকরদেবের মৃত্যু ১৫৬৯ সালে। জন্ম ১৪৪৯ সালে—অবশ্য এর কোন সঠিক প্রমাণ নেই। অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীতে ৬৯ বছর শংকরদেব বেঁচেছিলেন। মাধবকন্দলী যদি শংকরদেবের মৃত্যুর পঞ্চাশবছর আগেও লিখে থাকেন তাহলে তিনি ষোড়শ শতাব্দীর লোকও হতে পারেন।

মহামাণিক্য সম্বন্ধে নানামুনির নানা মত। মাধবকন্দলী কৃত্তিবাসের পূর্ববর্তী এই কথা প্রমাণ করার চেষ্টাতেই—ঐতিহাসিক সত্যানুসন্ধানের চেয়ে একটি আন্তরিক ইচ্ছা সত্যের স্থান দখল করেছে—তা হলো মাধবকন্দলী এবং মহামাণিক্য চতুর্দশ শতাব্দীর লোক। ভণিতায় মাধবকন্দলী বলেছেন 'রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহামাণিকেয়ে
বরাহ রাজার অনুরোধে।'

অতএব ধরে নিতে হয় মহামাণিক্য নামে কোন বরাহরাজার উৎসাহে মাধবকন্দলী রামায়ণ লিখেছিলেন। কৃত্তিবাস যেমন গৌড়ের রাজার কথা লিখেছেন অথচ রাজার নামোল্লেখ করেন নি তেমনি মাধবকন্দলী রাজার নামোল্লেখ করে, কোথাকার রাজা তা লেখেন নি। উপরন্তু মহামাণিক্য কারো নাম না মহা মাণিক্য অর্থাৎ মাণিক্য মহান অর্থে ব্যবহার হয়েছে—এই সন্দেহে সমস্যা আরও জটিল হয়েছে। শংকরদেব লিখছেন

"পূর্বকবি অপ্রমাদী মাধবকন্দলী আদি
বিরচিল পদে রাম কথা
হস্তীর দেখিয়া লাদ শশা যেন কারে মার্গ
মোরো ভৈল তেহ্নয় অবস্থা।"

হেমচন্দ্র গোস্বামী বলেছেন "Mahamanikya was a King of the Barahi Kacharis and that he ruled about the middle of the fourteenth century at Dinapore".

সুতরাং গোস্বামী মহাশয়ের মতে মাধবকন্দলীও চতুর্দশ শতাব্দীতে গেলেন। তাঁর এই কাল নির্ণয়ের যুক্তি হলো আহোম বুরন্ধীর বংশপঞ্জীগত আনুমানিক হিসাব। আহোম রাজা দিহিঙ্গীয়ার রাজত্বকাল ১৪৯৭-১৫৩৯ খৃঃ। তাঁর সমসাময়িক কাছাড়ীরাজা দেরচোংফা মহামাণিক্যের প্র-প্র-প্র-পৌত্র অর্থাৎ মহামাণিক্য থেকে পাঁচপুরুষ। তাই প্রত্যেক পুরুষ তিরিশ বছর রাজত্ব করেছেন এই হিসেবে গোস্বামী মহাশয় দেড়শো বছর পাঁচপুরুষে পৌঁছিয়ে গেছেন। টেনে টুনে হিসেব করলে এটা দাঁড় করানো যেতে পারে। কনক শর্মা তাঁর সম্পাদিত মাধবকন্দলীর রামায়ণের ভূমিকায় বলছেন, উপরোক্ত হিসাবের জোরে, যে "ইয়ার দ্বারা অনুমান করিব পারি যে মহামাণিক্য ১৩৫০ খৃষ্টাব্দর পরা ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দ ভিতরত ডিমাপুরু রাজত্ব করিছিল আরু সেই সময়ত মাধবকন্দলীয়ে রামায়ণ লিখিছিল।" বলাবাহুল্য গড়ে তিরিশ বছর রাজত্ব পৃথিবীর খুব কম রাজবংশই দেখা যায়। এই আনুমাণিক হিসাবের বিশেষ কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। মাধবচন্দ্র বরদলৈ ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে মাধবকন্দলীর রামায়ণ ছাপালেন। জয়ন্তীয়া ও কাছাড়ী রাজবংশের মধ্যে নিবিড় নৈকট্য ছিল। কাছাড়ী রাজারা কখনো কখনো জয়ন্তীয়া থেকে রাজ্যশাসন করেছেন বলে তাঁদের জয়ন্তেশ্বর বলা হতো। মাধব বরদলৈ তাই তিনজন জয়ন্তীয়া রাজাকে মাহামাণিক্য বলে সন্দেহ করেছেন। বিজয়মাণিক ১৫৬৪-১৫৮০) ধনমাণিক (১৫৯৬-১৬০৫) যশমাণিক (১৬০৫-১৬২৫)—এই তিনজনের একজনকে মহা মাণিক্য অর্থাৎ 'great' মাণিক্য অর্থে মাধবকন্দলী উল্লেখ করেছেন বলে মনে করেন। কিন্তু এঁরা সকলেই শংকরদেবের পরবর্তীকালের নরপতি। সুতরাং এই অনুমানও খুব যুক্তিযুক্ত নয়।

এই প্রসঙ্গে কেউ কেউ ত্রিপুরার মহামাণিক্যের উল্লেখ করেন। কালীরাম মেধী তাঁর Assamese Grammar and origin of Assamese Language- -এ এই কথাই বলেছেন। ত্রিপুরার মহামাণিক্যের কাল ১৪৩০ পর্য্যন্ত। মেধী মহাশয় ধরেছেন ১৪০৬। তিনি লিখছেন About the thirteenth century Ratnapha, King of Tripura first assumed the surname 'Manikya'. Since then all succeeding kings of Tripura and also probably the kings of Jayantia and Hedamba assumed the surname. Ratnaphas great grand-son was 'Maha-manikya'......... A prominent Assamese poet Madharva Kandali translated the whole of the Ramayana into Assamese under orders of "Maha Manikya Barahi Raja'. This Maha-Manikya was evidently the Tripura King of that name".

কিন্তু মাধবকন্দলীকে ত্রিপুরার কবি প্রমাণ করা শক্ত। কারণ তাহলে 'বরাহরাজা'র ব্যাখ্যা হয় না। দ্বিতীয়তঃ ত্রিপুরার রাজসভায় রামায়ণ রচনার পরবর্তী ধারা আর রইলো না কেন। মাধবকন্দলীর মত কবি, যিনি পূর্বভারতের বিরাট অংশে রামায়ণের তৃষ্ণা মিটিয়েছেন তাঁর ধারা কেউই অনুসরণ করলো না। ত্রিপুরার কোন ইতিবৃত্ত বা লোকস্মৃতিতে তাঁর চিহ্নমাত্র রইলো না, তাঁর কোন পুথি ত্রিপুরায় পাওয়া গেল না—এ সবই প্রমাণ কর্চ্ছে তিনি ত্রিপুরার নন। তা ছাড়া তাঁর নামের শেষে 'কন্দলী' তাঁকে ত্রিপুরা থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়। 'কন্দলী' উপাধি ত্রিপুরায় চলতো বলে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই—লোকপ্রবাদও নেই।

কেউ কেউ বলেন যে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত কাছাড়ি রাজাদের বরাহি রাজা বলে। বরাহ একটি পাহাড়ের নাম। অভিধানে দেখা যাচ্ছে "বরাহ পর্বতবিশেষের কাছেই রামায়ণবর্ণিত প্রাগজ্যোতিষ শহর ছিল।" (সুবল মিত্র) সেই পর্বতের নাম অনুযায়ী বরাহী রাজবংশ নাম হওয়া বিচিত্র নয়। কপিলি উপত্যকার রাজাদের অনেকেই মাণিক্য নাম

গ্রহণ করেছেন। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির প্রাপ্ত একটি শিলালিপিতে 'মাণিক্য' শব্দ পাওয়া গেছে। জনৈক ঐতিহাসিক লিখছেন যে কাছাড়ি রাজবংশে ১৪৬০-১৪৭০ খৃষ্টাব্দে মহামাণিক্য নামে এক রাজা ছিলেন। তিনিই মাধবকন্দলীর পৃষ্ঠপোষক—

"In the Kapili Valley, Mahamanikya Deva—a Scion of the ancient Varahi Pala dynasty patronised Madhav Kandali, a Brahmin of Nowgong to translate various chapters of the Sanskrit Epic Ramayana (Background of Assamese Culture—R. M. Nath P. 51).

এত গবেষণাতেও সিদ্ধান্ত কিছু স্থির হলো না। উপরোক্ত ঐতিহাসিক মহামাণিক্যের এই কাল কোথায় পেয়েছেন তা জানান নি। অন্য কোন ইতিহাসে মহামাণিক্যের কোন সঠিক কাল নেই।

মাধব কন্দলী কোথাকার লোক এ প্রশ্নও উঠতে পারে। তাঁর কাব্যে তিনি নিজের সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নি। ফলে তিনি কোথাকার লোক তা সঠিক জানবার উপায় নেই। মাধব বরদলৈ তাঁকে নগাওঁর আলিপুখুরির লোক বলে ধরে নিয়েছেন। এর কোন প্রমাণ নেই। শংকরদেবের জন্মস্থান আলিপুখুরিতে— সেই সংস্কারেই হয়তো তিনি এ কথা বলেছেন। মাধব কন্দলীর নামের কন্দলী তাঁর বংশপরিচয় ঢেকে ফেলেছে। ফলে বংশগত সূত্র সন্ধানের চেষ্টাও করা যায়নি। নওগাঁয় কন্দলি নামে মৌজা এবং গ্রাম দুই আছে। রাজমোহন নাথ আসাম রিসার্চ সোসাইটির জার্ণালে (৭ম খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠা) এক প্রবন্ধ লিখে এই কন্দলির সঙ্গে মাধব কন্দলিকে যুক্ত করে ঐখানেই মাধব কন্দলীর বাস স্থির করে ফেলেছেন। কিন্তু 'কন্দলির' অর্থ তর্কনিপুণ যে সব পণ্ডিত সভায় তর্কযুদ্ধে বিপক্ষকে পরাস্ত করেছেন তাঁদেরই কন্দলি বলা হতো। অনন্ত কন্দলীর লেখাতেই পাওয়া যাচ্ছে 'তর্কত লভিলা নাম অনন্ত কন্দলি।' সুতরাং 'কন্দলি' তাঁর বাসস্থান নির্ণয়ে বাধাই দেয় সুরাহা হতে দেয়না। কন্দলি গ্রাম ও মাধব কন্দলির যোগাযোগের তাই কোন প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হলো না।

মাধব কন্দলি কোন রাজসভার কবি সে সম্বন্ধেও কিছু স্থির হলো না। লোক প্রচলিত ধারণা তিনি কাছাড়ের কবি। কাছাড় রাজসভায় একসময় বাংলা শ্রীহট্ট ত্রিপুরা থেকে দলে দলে ব্রাহ্মণরা গিয়ে বসবাস করতে থাকেন। ফলে রাজসভায় বাংলাভাষার প্রচলন হয়েছিল এবং বাংলাই যে কাছাড়ের রাজভাষা ছিল এ সম্বন্ধে বোধহয় খুব সন্দেহের কারণ নেই। মাধব কন্দলীর ভাষা যে বাংলা এ কথাও ভাষাতাত্ত্বিক সুকুমার সেন বেশ জোর দিয়ে বলেছেন। কাছাড় ও জয়ন্তিয়ার মধ্যবর্তী সীমানাসূচক স্তম্ভ যা নওগাঁর যাদুঘরে রক্ষিত আছে তাও বাংলায় লেখা। ডক্টর সুকুমার সেন বলছেন "কামরূপে রচিত বাংলা কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে এই সময়েই, অর্থাৎ ষোড়শ শতকের মধ্যভাগ হইতে। এই সাহিত্য এখন প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য বলিয়া পরিচিত। ইহা আধুনিক আসাম বলিয়া পরিচিত অঞ্চলের সাহিত্য বটে তবে অসমীয়া সাহিত্য নয়। অসমীয়া ভাষার সুস্পষ্ট এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সপ্তদশ শতকের পূর্বে দেখা দেয় নাই। ষোড়শ শতকের সাহিত্যের ভাষা পুরাপুরি ভাবে বাংলার উত্তর পূর্ব অঞ্চলের কথ্যভাষা। উত্তর পূর্বাঞ্চলের পত্রসংকলন করে ঐতিহাসিক সুরেন সেন বলছেন "ভুটান, কুচবিহার, আসাম, মণিপুর ও কাছাড়ের নরপতিগণ এই ভাষায়ই পরস্পরের সহিত পত্রালাপ করিতেন। বাংলাই ...... তখন পূর্বোত্তর ভারতের রাষ্ট্রভাষা ছিল।" (প্রাচীন বাংলা পত্র সংকলন) অসমীয়া পণ্ডিত ও সাহিত্যিকেরা এই কথা স্বীকার করেন নি।

মাধব কন্দলী তাঁর কাব্যের ভণিতায়, লংকাকাণ্ডের শেষে রাজার কথা রাজার অনুরোধের কথা বলেছেন—

কবিরাজ কন্দলিয়ে আমাকে সে বুলি হয়ে
করিলাহোঁ সর্বজনবোধে
রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহামাণিক্যেয়ে
বরাহ রাজার অনুরোধে।
সাতকাণ্ড রামায়ণ পদবন্ধে বিরচিলোঁ
লম্ভা পরিহরি শকে ধৃত
মহামাণিকর বোলে কাব্যরস কিছো দিলোঁ
দুগ্ধ মথিলে যেন ঘৃত।
পণ্ডিত লোকর যেরে অসন্তোষ উপজয়
হাতযোরে বোলোঁ শুদ্ধবাক
পুস্তক বিচারি যেবে তৈত কথা ন পাবাহা
তেবে সবে নিন্দিবা আমাক।
বলে সাগরক তরি দাশরথি রাম হরি
লঙ্কা নগরীত পয়োসার।
ঘোর সমরক করি রাবণক সংহরিয়া
দেবতার চিন্তিলা নিস্তার ॥
শুনিয়োক সভাসদ রামায়ণ কথা ইটে।
পাতকর সাক্ষাতে অগণি
মমদুঃখ গৃহবাস জানিয়া এরিয়ো আশ
চিন্তা রঘুবংশ শিরোমণি ॥
অগণিত পরিক্ষীয়া সীতাক অযোধ্যা নিয়া
সকুটুম্বে ভৈলা একঠাই।
মাধব কন্দলী গাইলা শ্রীরামে অযোধ্যা পাইলা
জয় জয় আনন্দ বর্ধাই ॥

মাধব কন্দলীর রামায়ণ উত্তর ভারতীয় আর্যভাষায় রচিত রামায়ণগুলির মধ্যে একটি প্রধান স্থান অধিকার করে আছে। এই রামায়ণ নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণ কচ্ছে যে হিন্দু পৌরাণিক ধর্মের প্রেরণা সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠপোষক রাজবংশকে প্রভাবিত করেছিল। মাধব কন্দলী যতদূর পেরেছেন বাল্মীকির কাঠামো বজায় রেখেছেন। তবে রাম যে বিষ্ণুর অবতার হয়ে পড়েছেন সেটা অনেকেই পরবর্তী কালের প্রক্ষেপ বলে মনে করেন। শংকরদেবের সমসাময়িক বা পরবর্তী কোন বৈষ্ণব লিপিকারের হাতে পড়ে এ কাজ হয়ে থাকতে পারে।

শংকরদেব এবং মাধবদেব মাধব কন্দলীর রামায়ণে আদি ও উত্তর কাণ্ড যোজনা করেছিলেন। গল্প আছে মাধবকন্দলী স্বপ্নে শংকরদেবকে বল্লেন যে অনন্ত কন্দলি তাঁর নাম আত্মসাৎ করতে চাইছেন, সুতরাং তিনি যেন এ ব্যাপারে মাধব কন্দলীকে সাহায্য করেন। শংকরদেব এবং মাধবদেব মাধবকন্দলীর রামায়ণে দুটি সর্গ যোজনা করেই ক্ষান্ত হননি মনে হয় কিছু কিছু আভ্যন্তরীন নব রূপায়ণ সব সংগেই হয়েছে। কৃষ্ণভক্তির আধিক্যই এই সন্দেহের সৃষ্টি করে— "এই প্রমাণলৈ চালে অনুমান করিব পারি যে মহাপুরুষ দুজনাই কেবল আদি আরু উত্তরকাণ্ড

রচিয়েই কান্ত নৱে মাধব কন্দলীর নামটো ৱাখি আন আন অধ্যায়তো উপদেশ আদি সন্নিবেশ করি রামায়ণকো কৃষ্ণভক্তি শাখার অন্তর্গত করিবলৈ চেষ্টা করছিল। কিন্তু সন্থে জন্মোবা পদবোরর কোনখিনি মাধবকন্দলীর আরু কোনখিনি শংকরদেব মাধবদেবর সেইটো নির্ণরণ করা টান।" (অসমীয়া রামায়ণ সাহিত্য-উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু)

শংকর দেবের সঙ্গে সঙ্গেই কামতা কামরূপ কাছাড়ে বৈষ্ণবতার যথার্থ প্রসার হলো। তারপূর্বে পৌরাণিক ও তান্ত্রিক হিন্দুধর্মেরই প্রসার ছিল। সুতরাং রামচন্দ্রের যে নবদুর্বাদল-শ্যাম মূর্তি মাধবকন্দলীর রামায়ণেই আছে তা শংকরোত্তর হওয়াই সম্ভব। অরণ্যকান্ডে রামকে নারায়ণ জেনে প্রণাম করতে বলা হয়েছে— কান্ডশেষে রামের বর্ণনা বৈষ্ণবোচিত

নমো নমো রাম দুর্বাদলশ্যাম
করে যার গুণনাম ॥
তনু অতি অনুপম।
গৃহস্তর যত ধর্মক প্রকাশ
সর্ব পুরুষার্থ শিরত প্রকাশ
করিলন্ত মহাহরি

* * * * *

ইহার শ্রবণ কীর্তনে তরয়
মহামহা পাপীচয়।

লংকাকান্ডের শেষে বলছেন

হেন দেব হরি মায়া বশ্য করি
পরমাত্মা তত্ত্ব ভৈলন্ত বেকত
হিত চিন্তি জগতর
রাজ দশরথ ঘর।

এর সঙ্গে উত্তরকান্ডে শংকরদেবের ভণিতাগুলি লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট হবে যে উপরোক্ত কাব্যাংশগুলি শংকরদেবের হওয়া কঠিন নয়। উত্তরকান্ডে শংকরদেব নিজেকে কৃষ্ণের কিঙ্কর বলেছেন

নমো রঘুপতি চরণে সম্প্রতি
কৃষ্ণের কিঙ্করে রচিলা শংকরে
প্রণতি করোঁ সর্বথা
উত্তরকান্ড কথা।

রামচরিত্র গানকে শংকরদেব কীর্তন বলে অভিহিত করেছেন। মাধব কন্দলী যে নিজের পদকে কীর্তন বলবার মত বৈষ্ণবপ্রাণ ছিলেন এ কথা মনে করার কারণ নেই। শংকরদেব লিখছেন

শুনা নিরন্তর সবে রামায়ণ পদ।
যাহার কীর্তনে তরি সংসার আপদ ॥

ইতিপূর্বে কামতায় যে সাহিত্যচর্চা হয়েছিল বলে অসমীয়া পন্ডিতমন্ডলী দাবী করেন তাও মহাভারতের কাহিনী কেন্দ্র করে। তার মধ্যে বৈষ্ণবতার এই প্রবল উচ্ছ্বাস নেই। চৈতন্যপূর্ব বাংলায় জয়দেব চন্ডীদাস বিদ্যাপতি যেমন ভক্তিধর্মের জয়যাত্রার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন আসামে শংকরদেবের পূর্বে তেমন কিছু হয়নি। সুতরাং মাধবকন্দলীর কাব্যে রামচন্দ্রের এই বৈষ্ণবমূর্তি পরবতী প্রলেপ বলে মেনে নিতে কোন অসুবিধা নেই।

মাধবকন্দলীর অগাধ ভক্তি ছিল মহাকবি বাল্মীকির প্রতি। বার বার তিনি সশ্রদ্ধ চিত্তে বাল্মীকির উল্লেখ করেছেন। রামায়ণের 'লম্ভা পরিহরি সারোদ্ধৃত'— বাজে কথা পরিহার করে শুধু সারটুকু উদ্ধৃত করেছেন। মোটামুটি আয়তনে সংক্ষিপ্ত করলেও তিনি মূল রামায়ণের কাঠামোটুকু বজায় রেখেছেন। তাছাড়া কৃত্তিবাসের মত এত অত্যাচার হয়নি বলেই আজও তাঁর মূল রূপটি আমরা ধরতে পাচ্ছি।

দ্রষ্টা জগদীশচন্দ্র

সনৎকুমার রায় চৌধুরী

অতীতে ছায়াময় তপোবনে একদিন আর্য্য ঋষিরা তাঁহাদের শুচিধৌত অন্তর আলোকে সত্যকে উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁহাদের গভীরতম অন্তর থেকে সেইদিন উচ্ছ্বসিত হয়েছিল এক মহান্ মন্ত্র "শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্।" সারা পৃথিবী জুড়ে একটি বিশ্ববীণা ধ্বনিত, একটি সুরের ধারা প্রবাহিত বয়ে চলেছে। "যদিদং কিঞ্চ জগৎ সর্বং প্রাণ এজতি নিঃসৃতং"—একটি প্রাণসমুদ্রের ধারা ফুলে ফলে পল্লবে তরঙ্গিত হয়ে চলেছে। যুগযুগান্তরে প্রাণের এই নির্মল ধারা বয়ে চলেছে প্রাণীর জীবকোষে, তরুমর্মরে, ধূসর মরুভূমির বক্ষস্থলে, পাষাণের অন্তরালে। যুগের পর যুগ বিলীন হয়ে গেছে মহাকালের অনন্তসায়রে। আমারা অন্ধ, বধির ও নির্মম, নিত্যপ্রবাহিত বিশ্বব্যাপী প্রাণের ছন্দ, তার সুরের রেশ, আমাদের মনে কোন তরঙ্গ সৃষ্টি করেনি। আমাদের বাতায়নের পাশ দিয়ে সেই স্রোত, সেই সঙ্গীতের ধারা নিত্য বয়ে চলেছে, আমাদের মনে তার কোন সাড়া নেই, প্রতিধ্বনি নেই। বিংশ শতাব্দীর প্রভাবে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ নিজের জীবনদেবতার প্রসাদে সর্বব্যাপী প্রাণের গতিউৎসবকে মর্মেমর্মে অনুভব করলেন। ধ্বনিত হোল তার কণ্ঠে—

ওই দেখি আমি অন্তবিহীন সত্ত্বার উৎসবে
ছুটেছে প্রাণের ধারা—

কাব্যলোকের অদূরে বিজ্ঞান গবেষণাগারে ধ্যানমগ্ন এক তপস্বীর চোখে এক সময়ে বিশ্বব্যাপী প্রাণলীলা প্রকাশিত হোল। মহাযোগী বৈজ্ঞানিক গভীর গবেষণার ফলে চেতন ও অচেতনের রহস্যময় যোগসূত্র আবিষ্কার করলেন। তাঁহার দৃষ্টিপথে প্রতিভাত হোল একটি চেতনা প্রবাহ, একটি প্রাণের ধারা তার বিভিন্ন তরঙ্গরাশি, আনন্দ-বিষাদ পৃথিবীর সর্বপ্রান্তরে পল্লবে, ফুলে ফুলে, মানুষের হৃদয়কন্দরে বিভিন্ন ছন্দে স্পন্দিত ও দোলায়িত হয়ে চলেছে। তিনি হলেন আমাদের আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু। তিনি এক সন্ধ্যায় Royal Instituteএ "The response of inorganic matter to mechanical and electrical stimulus" সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছেন— "I have shown you this evening the autographic records of the stress and strain in both the living and non-living. How similar are the two sets of writings, so similar indeed that you can not tell them one from the other! They show you the waxing and waning pulsations of life—the climax due to stimulants, the gradual decline of fatigue, the rapid setting in of death-rigor from the toxic effect of poison.

It was when I came on this mute witness of life and saw an all-perrading unity that finds together all things—the note that thrills on ripples of light, the teeming life on earth and the radiant suns—that shine on it—it was then that for the first time I understood the message proclaimed by ancestors on the banks of the Ganges Thirty Centures ago—

"They who behold the due, in all the changing manifoldness of the universe, unto them belongs eternal truth, unto none else, unto none else".

যেদিন বৈজ্ঞানিক অনুবিশ্লেষণ ক্ষেত্র সীমালঙ্ঘন করে আচার্য্য জগদীশ দার্শনিকের জগতে প্রবেশ করলেন অথবা ধীর সমাহিত চিত্তে সত্যিকার দ্রষ্টার (Spectator) দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জগৎ পারাবারাকে দর্শন করলেন সেদিন তাহার চোখ থেকে নানা বৈচিত্র্য, খন্ড খন্ড ভাসমান জগৎ দূরে সরে গেল। এক অখন্ড সত্ত্বা, একটি প্রাণ প্রবাহ উদ্ভিদ থেকে সুরু করে মানুষ পর্য্যন্ত, নিখিল জীবলোকে একই প্রাণস্পন্দন অনুভূত হচ্ছে, একই প্রাণধারা সর্বত্রই প্রবহমান তাঁহার দৃষ্টি পথে প্রতিভাত হোল। বিচিত্রতার মাঝখানে আমরা খুঁজে পেলাম এক অচ্ছেদ্য ঐক্যকে।

"যে বাধা একদিন আত্মীয় হইতে আত্মীয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল তাহা দূর হইল, উদ্ভিদ ও প্রাণী একই জীবনধারার বহুমুখী বিকাশ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। এই মহাসত্যকে জানিতে পারিলে জগদ্ব্যাপারে পরম রহস্যের যবনিকা ঘুচিয়া যাইবে না, বরং গভীরতর নিবিড়তর হইয়া উঠিবে। মানুষ যে তাহার অসমাপ্ত জ্ঞান, অসম্পূর্ণ দৃষ্টি ও অক্ষম শক্তি লইয়াও অবির্ণীত-দিক মহাসমুদ্রে দুঃসাহসিক জয়যাত্রায় আপনার চিত্ততরণী ভাসাইয়া দিল এ কি কম আশ্চর্যের কথা? সে অবর্ণনীয় রহস্য তাহার দৃষ্টির অগোচর ছিল, এই অভিযান পথে অকস্মাৎ এক-একদিন সে রহস্য মুহূর্তকালের জন্য তাহার গোচরীভূত হইতে থাকে এবং যে আত্মসর্বস্বতা এতকাল বিশ্বব্যাপী প্রাণস্পন্দনের প্রতি বিমুখচিত্ত করিয়া রাখিয়াছিল তাহার মন হইতে মুহূর্তকালের মধ্যে নিঃশেষে মিলাইয়া যায়।"

বিজ্ঞানী ও দ্রষ্টা জগদীশচন্দ্রের নিকট বিশ্বপারাবারের ঐক্যসূত্র আপনাকে অকপটে ধরা দিল। এই উপলব্ধি অন্তরালে শুধুমাত্র বৈজ্ঞানিক বস্তুনিষ্ঠ মননশীলতা ছিল না, এর সাথে ছিল জগদীশচন্দ্রের কবিমানস, দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী। আচার্য্য নিজে স্বীকার করেছেন "বৈজ্ঞানিক ও কবি, উভয়েরই অনুভূতি অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে।" বৈজ্ঞানিক ও কবিচিত্তের সমন্বয় সাধন আচার্য্য জগদীশচন্দ্রকে ঋগ্বেদে কথিত কবি ও দ্রষ্টার আসনে বসিয়েছে। পথপ্রান্তের একটি লতার কম্পন এই দ্রষ্টার দৃষ্টিপথ থেকে বিচ্যুত হয় নি। তাঁহার জীবন জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। জড় ও চেতনের সীমারেখা উত্তীর্ণ করে প্রাচীন ঋষিদের গভীর উপলব্ধি তাঁকে রহস্যাবৃত জগতের Mysterious universe সন্ধান দিয়েছিল। এই মহাপরিব্রাজক শুধু দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ করে বৈজ্ঞানিক জগতের নব নব তথ্য ও দিগন্ত উন্মোচন করেন নি, তিনি যাত্রা করেছেন অজ্ঞাত, চিররহস্যাবৃত জগতের অন্ধ গুহাতলে। যে জগৎ ছিল এতোদিন অজানা, নির্বাসিত ও আঁধারে লুকিয়ে ছিল, এই বৈজ্ঞানিক যাদুকরের স্পর্শে সেদিন আমাদের সাথে অজানা জগতের সম্বন্ধ হোল নিবিড়। হাজার হাজার বছরের মৌনতা ভঙ্গ করে আমাদের চারিপাশে বোবা গাছপালা, নিস্পন্দ বস্তুরাশি ধীরে ধীরে এগিয়ে এল, সখাবন্ধুর মতো হাত বাড়ালো। যে ভাষা ছিল এতোদিন অব্যক্ত তাঁর ইসারা এসে গুণগুনিয়ে উঠল, তার অর্থ হোল সুস্পষ্ট। এ কী শুধু বৈজ্ঞানিক সদাজাগ্রত প্রহরীর মননশীলতার ফলে এই অন্ধকারাগারে বন্ধ মৌন জীবনের অব্যক্ত ভাষা হোল ব্যক্ত, তাহাদের হর্ষ বিষাদ আমাদের চোখে ধরা পড়ল। না, তা নয়, এর পিছনে যেমন একদিকে ছিল আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের যুক্তিনিষ্ঠা বৈজ্ঞানিক চিত্তবৃত্তি তাঁর সাথে সদা যুক্ত ছিল তাঁর সর্বতোমুখী বোধশক্তি, সুনিপুণ ভাবাবেগ, কবিমনের চিরন্তন মানসযাত্রা। এই অপরূপ সমন্বয় যোগ সাধন তাঁহার দৃষ্টিপথকে করেছে বিশ্বকেন্দ্রিক, জীবনকে করেছে ধীর ও সমাহিত, সাধনাকে করেছে বরণীয় ও ভাস্কর।

"কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই

তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা সেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে; কিন্তু কবিত্ব সাধনার সহিত তাঁহার সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন, প্রগতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় পৌঁছায় সেখান হইতেও তিনি কম্পমানবাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত সে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিনরাত্রি কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া দুর্বোধ উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানব-ভাষার যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন।"

(অব্যক্ত—জগদীশচন্দ্র বসু)

কবি-মানস এবং বৈজ্ঞানিক অনুশীলন ও মননশীলতার যোগসাধনা জগদীশচন্দ্রের জীবনকে করেছে উদ্ভাসিত, দৃষ্টিকে করেছে সুদূরপ্রসারী ও অন্তর্ভেদী। নিছক ভাবাবেগ তাঁহার ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তিকে নিস্প্রভ করে নি, অপরদিকে বুদ্ধিবৃত্তির নিত্য অনুশীলন ও চুলচেরা অনুসন্ধান তাঁহার মনকে যান্ত্রিক, প্রাণহীন করে তোলেনি। তিনি ছিলেন সত্যিকার প্রাণবান পুরুষ, নিজের জীয়নকাঠির স্পর্শে জাগিয়ে তুললেন জড়তার বন্ধকারাগার থেকে চিরমৌন, তথাকথিত অচেতন উদ্ভিদ্ শিশুদের। এই বৈজ্ঞানিকসাধনার পিছনে রয়েছে অসীম ধৈর্য্য ও অনুরাগ। শিল্পী আচার্য্য নন্দলাল বসু এক জায়গায় বলছেন "ধানখেতের সবুজ তোমার এত ভালো লাগা চাই যে, তুমি ঐ সবুজ হয়ে গেলে।" প্রাণের সঙ্গে প্রাণের নিবিড় পরিচয়। আচার্য্য জগদীশ একই সুরের অনুসরণ করে বলছেন "গাছপালায় জীবনের কাজ আবিস্কার করতে হলে নিজেকে গাছপালার মত হতে হবে, তবেই তার প্রাণস্পন্দন অনুভব করা সম্ভব হবে।

ঈপ্সিত কাম্যবস্তুর ভিতর নিজেকে লীন হয়ে যাওয়া বা একাত্মা হওয়া, এই যোগসাধনা হোল শিল্প বা বিজ্ঞানের মূলসূত্র। যে কবি, বৈজ্ঞানিক ও শিল্পী ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র সীমিত জীবনের পরিধিকে নিজের সাধনার বলে অতিক্রম করে পরিদৃশ্যমান জগতপারাবারকে সম্যগ দর্শন কর্তে পারেন, তাঁহার দৃষ্টিপথে কোন মোহ, বাধা সৃষ্টি হতে পারে না। তাঁহার দৃষ্টি হয় মোহহীন, সদাউন্মুখ, মনমরমী ও সংবেদনশীল, চেতনা বিশ্বব্যাপী ও সদাপ্রবহমান। এরা হলেন সত্যিকার দ্রষ্টা, এদের চোখে সমস্ত রহস্য জাল ভেদ করে ভেসে ওঠে বিশ্বজুড়ে প্রাণের অবিরাম লীলা।

"এ ষোহগ্নিস্তপত্যেষ সূর্য্য এষ পর্জনো মঘবানেষ বায়ুঃ।
এষ পৃথিবী রয়ির্দেবঃ সদসচ্চামৃতং চ যৎ ॥ প্রশ্যোপনিষদ্ (২/৫৩)

এই প্রাণই অগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত, সূর্য্যরূপে প্রকাশিত; এই প্রাণই মেঘরূপে বর্ষণ করে, ইন্দ্ররূপে দুষ্টের দমন করে প্রজা পালন করেন; এই প্রাণই বায়ুরূপে প্রবাহিত; এই প্রাণই পৃথিবীরূপে সকলকে ধারণ করেন, চন্দ্রমারূপে সকলকে পোষণ করেন; এই প্রাণই স্থূল সূক্ষ্ম সব কিছুর আধার। মৃত্যুর পারে যে অমৃত জীবন তাহাও এই প্রাণ।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যে জীবন জিজ্ঞাসা

ভবানীগোপাল সান্যাল

রবীন্দ্র ঐতিহ্যের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া যে কয়েকজন কবি রবীন্দ্রোত্তর কাব্যধারার প্রবর্তন সচেষ্ট ভাবে করিয়াছিলেন যতীন্দ্রনাথ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া, প্রতিবাদ করিয়া, কোন নূতন কিছু সৃষ্টি করা দুঃসাধ্য বলিয়া যেমন এই যুগেও অনুভূত হয় তেমনি ছিল সেই যুগেও। এই যুগের কবিকুলের সহিত সমরোত্তর যুরোপের কবিগণের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হইয়াছে। যুদ্ধ পরবর্তী জীবনের জটিলতা ও বহু বিচিত্র সমস্যা আমাদের দেশেও দেখা দিয়াছে। জীবনের ক্ষেত্রে দিয়াছে সন্দেহ, সংশয় ও ভগবদ্ বিধানের বিরুদ্ধে গভীর অবিশ্বাস। স্বভাবতঃ, এই যুগের কাব্য রবীন্দ্র ঐতিহ্যের পরিপন্থী হইতে পারে। উপরন্তু, সমাজতন্ত্রবাদের পরীক্ষা বিভিন্ন দেশে সাফল্যের সঙ্গে চলিয়াছে। ইহার প্রভাবে, সাহিত্যে এক নূতন পরীক্ষার ধারা দেখা গিয়াছে। প্রলেটারিয়ান হিউম্যানিজম্, এই আদর্শ লইয়া নূতন সাহিত্য সৃষ্টির প্রচেষ্টাও এই যুগে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধোত্তর যুগ আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টিরপথ প্রশস্ততর করিয়াছে। ইতিহাসের অনিবার্য্য গতিতে এই সাহিত্য জন্মলাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে ছিল যে চিন্তা, ভাবনা ও ভারতীয় সাধনার প্রভাব, যে আদর্শ তাঁহার কবি-মানস গড়িয়া তুলিয়াছিল, তাঁহার পক্ষে জীবন সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহ করিবার কোন উপায় ছিল না বা মানবতা ও মানব-জীবন বর্জন করিয়া প্রলেটারিয়ান সমস্তরে ঘোলা গঙ্গা স্রোতে ভাসিয়া আসাও সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ জীবন প্রেমিক বলিয়া মানুষ ও প্রকৃতিকে ভালবাসিয়াছেন। প্রকৃতি হইতে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করিয়া কদাপি তিনি দেখেন নাই, ইহা ভারতীয় ধারাও নহে। জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষকে তিনি অবিচ্ছিন্ন পদার্থ রূপেও দেখেন নাই। মানুষের জীবনে শোক, দুঃখ, বেদনা ও মৃত্যুকে খণ্ড দৃষ্টিতে বিচার না করিয়া জীবন-প্রবাহের সহিত তাহাদের মিলাইয়া স্বরূপ উপলব্ধির চেষ্টা করিয়াছেন। তাই দুঃখ তাহার নিকটে মনে হইয়াছে সুখের বিপরীত বস্তু। তাহারা উভয়ে মিলিয়া আনন্দময় পরিণামের মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। আনন্দের উপলব্ধির জন্য বেদনার সার্থকতা যেরূপ প্রয়োজনীয় জীবনের সার্থকতা তেমনি মৃত্যুর মহা পরিণামে। যাঁহারা খণ্ড দৃষ্টিতে জীবনকে দেখিতেন তাঁহাদের নিকটে জীবনের মহিমা ও মূল্য অপেক্ষা মৃত্যুর ভূমিকা ব্যাপকতর ও অধিকতর সত্য। তাঁহারা বলিবেন জীবনের কোন স্বতন্ত্র মূল্য নাই। মৃত্যুই ইহার অধিদেবতা।

মৃত্যু ভয়ের কারণ-সূত্রে জীবনের মালা গাঁথা
সূত্র যেমনি টুটে,
ধূলায় ছড়ানো মালার টুকরো পাঁচ ভূতে লয় টুটে।

ঔপনিষদিক প্রভাবে সমগ্র জীবনকে দেখিবার সাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া রবীন্দ্রনাথ আনন্দবিশ্বাসী। এই বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত হইয়া তিনি জীবনকে পরিপূর্ণ চিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। জগৎ রহস্যের মূলে যে ঐক্যরূপ আছে, যাহা সমগ্র সৃষ্টিকে সার্থকতা দান করে, তাহার প্রতি নিঃসংশয় শ্রদ্ধা তাঁহার জীবন-দর্শনের মূলে বিদ্যমান।

রবীন্দ্রনাথ জগৎকে বিশ্বাস করিয়া জীবনকে গ্রহণ করিয়াছেন ও জীবনের রূপলোক

হইতে অরূপের দিকে যাত্রা করিয়াছেন। রূপ ও অরূপ তাঁহার নিকটে এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত। অরূপের প্রতি তাঁহার মানসিক উৎকণ্ঠা তাঁহাকে জীবনের মর্মমূলে ফিরাইয়া আনিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিকতা তাঁহাকে বৈরাগ্যের মন্ত্রদান না করিয়া পরিণামে তাঁহাকে জীবনের রহস্য নিকেতনে উপনীত করিয়াছে। জীবনকে আরো গভীর, আরো নিবিড়ভাবে জানিবার প্রেরণা তাঁহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

জগতে জড়ের প্রাধান্য। তথাপি জড়ের উপরে মানুষের চেতনা জয়ী হইয়াছে। জড়ের বিরাট অঙ্ক হইতে যেদিন আবির্ভাব হইল প্রাণের, সেদিন সৃষ্টিলোকে এক পরম বিস্ময় সূচিত হইল। অবশেষে জীবন রঙ্গভূমিতে মানুষের অভ্যুদয়। চৈতন্যের আলোকে মানুষ জয় করিয়া লইল জড় জগৎ। এই চৈতন্যের প্রকাশ বিশ্বলোকে, আনন্দ অমৃতরূপে ইহার অসীম ব্যাপ্তি। প্রাণের সঙ্কীর্ণ সীমানায় যে-চৈতন্যের পরিচয় তাহা নিরর্থক নহে।

এ চৈতন্য বিরাজিত আকাশে আকাশে
আনন্দ অমৃতরূপে—

যাঁহারা পরিদৃশ্যমান জগৎকে একমাত্র প্রত্যক্ষ সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের নিকটে মানবশ্রয়ী চৈতন্য মূল্যহীন ও অলীক। মৃত্যুর মধ্যে চৈতন্যের অবলুপ্তি। আদি ও অন্ত তাহার অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন।

অসীম জড়ের মাঝে
চেতনা শক্তি ঘুমের ভিতর স্বপ্নের মতো বাজে।
শক্তি নিয়ত জড়ের মাঝারে বিরাম লভিতে চায়;
তন্দ্রা যেমন এলোমেলো পথে সুষুপ্তিপানে ধায়।

হৃদামনীষামনসা জগৎকে দেখিবার সংস্কার ছিল বলিয়া বাস্তব বলিতে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ গোচরকে একমাত্র সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। যাহা পরিদৃশ্যমান তাহা ছায়াচ্ছন্ন। বস্তুর অন্তরে যে রূপ তাহাই বাস্তব এবং এই বাস্তব মনাশ্রয়ী। তাই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে প্রত্যক্ষ বাস্তব অপেক্ষা বাস্তবের অন্তর্নিহিত রূপ স্বীকৃত হইয়াছে।

প্রত্যক্ষগোচর জীবনকে প্রাধান্য দেওয়ায় আধুনিক কবিগণ চৈতন্য অপেক্ষা জড়, জীবন অপেক্ষা মৃত্যুর মহিমাকে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের সহিত এইখানেই আধুনিক সাহিত্যের পার্থক্য।

আধুনিককালে জীবনের সমগ্রতা অপেক্ষা বিশেষ অর্থনৈতিক বিন্যাসে গঠিত সমাজের মূল্য অধিক। মানুষের ব্যক্তি-জীবন এই সমাজ বিন্যাসের দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। যেখানে সমাজ স্বাধীন নহে, অর্থনীতি যেখানে বহু মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত নহে সেখানে মানুষের দুঃখ অন্তহীন। এই পরাধীন পরনিয়ন্ত্রিত মানুষের কাহিনী ও স্বচ্ছন্দ জীবন লাভের যৌথ প্রচেষ্টা আধুনিক কালের সাহিত্যে তাই প্রকীর্ত্তিত।

এই নব সাহিত্যর পুরোযায়ী রূপে আমরা সাহিত্যের যে রূপটি পাই তাহাও মানুষের বেদনা ও ব্যর্থতার কাহিনী লইয়া রচিত।

সেই সাহিত্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কবিগণের বিশ্বাস শিথিল হইয়াছে। তাঁহারা দেখিয়াছেন মানুষের জীবনে সুখ অপেক্ষা দুঃখের প্রাধান্য বেশী। অন্তহীন দুঃখ ও বেদনার আবর্ত্তের মধ্য দিয়া জীবন একই পথে ঘুরিয়া চলিয়াছে। এই দুঃখ বিভীষিকা হইতে মুক্তির কোন উপায় নাই। এই জগতের যদি কেহ স্রষ্টা থাকেন তিনিও হয়ত বা অন্ধ নিয়মের

শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। স্রষ্টার দুঃখ জীবনের উপরে নিরন্তর ঝরিয়া পড়িতেছে। তাঁহার 'চিরবর্ষণে ফুরায় না তবু অফুরাণ আঁখিলোর'।

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ।

জীবন সম্পর্কে এই তত্ত্ব কবিদের স্বকপোল কল্পিত নহে, জীবনের অভিজ্ঞতা প্রসূত। ইহার বিপরীত পরিচয় আমরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যে বা অন্যান্য আদর্শবাদী কবিদের কাব্যে পাই।

এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি
এই মহা মন্ত্রখানি,
চরিতার্থ জীবনের বাণী।
দিনে দিনে পেয়েছিনু সত্যের যা কিছু উপহার
মধুরসে ক্ষয় নাই তার।

জীবন দুঃখের আকর। পৃথিবীতে নির্ভর করিবার মত কোন বস্তু নাই, এই তত্ত্বটি পরবর্তী কালে যুদ্ধের অভিজ্ঞতায় আরও দৃঢ় হইয়াছে। টি, এস, এলিয়ট তাঁহার কাব্যে জীবনের শূন্যতার ও নিরর্থক পরিণামের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। আধুনিক জীবন জরাজীর্ণ, কন্টকাকীর্ণ ও মৃত। একদিন এই পৃথিবী অকস্মাৎ শেষ হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে জীর্ণ পৃথিবী আমাদের ঘুটে কুড়ানী বৃদ্ধার মত পাক খাইয়া চলিয়াছে। জীবনে, লোভ, হিংসা, পাপ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। একমাত্র ভগবানের পদে শরণ লইলে আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি।

দুঃখবাদ, তত্ত্ব হিসাবে কোন কিছু নূতন নহে। এ্যাংলোসাক্সন কবিতায়, শেকস্‌পীয়র ও ওয়েবস্টারের নাটকে জনসনের কবিতায় ও টেনিসনের লোটার্স ঈটার্স নামক কবিতায় ইহার স্বরূপ কীর্ত্তিত হইয়াছে। শেকস্‌পীয়রের ট্র্যাজেডিতে মানুষের দুঃখ দুর্ভাগ্য ও পরাজয়ের কাহিনী থাকিলেও জীবনের জয় ঘোষিত হইয়াছে। ওয়েবস্টারের নাটকে হতাশা ও নৈরাশ্যের সুর প্রবল সন্দেহ নাই। অন্যান্য কবিদের কাব্যের দুঃখ ও বেদনার কথা বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি জীবন সম্পর্কে নিদারুণ হতাশা ও অবিশ্বাস কোথাও ধ্বনিত হয় না। এই হতাশা ও সন্দেহ আধুনিক যন্ত্র-যুগের দান। ব্যক্তি জীবনের নৈরাশ্যজনক অভিজ্ঞতা হইতে কবি মনে দুঃখ ও বেদনাবোধ সঞ্চারিত হয় বটে কিন্তু সমাজ-জীবন যখন কলুষিত হয় তখন জীবন সম্পর্কে শূন্যতাবোধ মনকে পীড়িত করে। ইহার পরিচয় আছে এলিয়টের কাব্যে। তবে, জীবন নিরর্থক, মৃত্যু জীবনের অধিদেবতা। জড়ের প্রাধান্য চৈতন্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। এই জাতীয় তত্ত্ব পাশ্চত্ত্য দার্শনিক সোপেন হাওয়ার কর্তৃক প্রভাবান্বিত বলিয়া অনুমিত হয়।

কিন্তু এই নেতিবাদ মূলক তত্ত্ব কবির কাব্যের উপজীব্য বিষয় নহে। কবি নিছক যুগ জিজ্ঞাসাকে রূপ দান করিবেন, নূতন জীবনের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করিবেন না, ইহা কবি-ধর্মের বিপরীত। কবি নিয়তিকৃতনিয়ম রহিত হইয়া নূতন জগৎ সৃষ্টি করিবেন, ইহাই ছিল প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিকগণের অভিমত।

প্রলেটারিয়ান সাহিত্য বাস্তব জীবনের উপর গুরুত্ব দান করে। কিন্তু বাস্তবের নিছক অনুকরণ নহে, শিল্পীর কর্তব্য নির্বাচন করা ও বাস্তবের অন্তর রূপের পরিচয় দান কারা। মার্ক টয়েন তাঁহার এক উপন্যাসে আমেরিকার দাস যুদ্ধের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু এই বর্ণনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে সুন্দর কাহিনীর মাধ্যমে ও তিনি ক্রীতদাস প্রথার নগ্নরূপ উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে বাস্তবের অন্তর রূপের পরিচয় আছে ও সঙ্গে সঙ্গে সব জীবনের ইঙ্গিতও পরিস্ফুট হইয়াছে।

টি, এস, এলিয়ট ও অন্যান্য কবিগণ সমৃদ্ধ ভাষা ও প্রতীকের সাহায্যে বর্তমান রুগ্ন জীবনের পরিচয় দিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের কাব্যেও সুন্দর জীবনের আশ্বাস আছে। সাধারণতঃ এই আশ্বাস কখনও-বা ভগবান ও ধর্ম বিশ্বাসের কখনো-বা শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে রূপ লাভ করিয়াছে। কিন্তু যেখানে জীবন সম্বন্ধে হতাশা, নৈরাশ্য, দুঃখ বা ব্যঙ্গের রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, সে কাব্যের মূল্য কালের বিচারে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রমাণিত হইবে।

সাহিত্য জগতে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কিঞ্চিৎ অপ্রত্যাশিত। পেশার দিক দিয়া তিনি ছিলেন এঞ্জিনিয়ার। তাঁহার বৃত্তির সহিত কাব্য-সাধনার আপাতদৃষ্টিতে বৈপরীত্য থাকিলেও, তিনি তাহা স্বীকার করিয়া লন নাই। তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ **মরীচিকা**। ইহার রচনাকাল ১৩১৭—১৩২৯। দ্বাদশ-বর্ষ ব্যাপী এই গ্রন্থের কবিতা সমূহ রচিত হইয়াছিল। প্রথম যখন কাব্য সাধনায় কবি ব্রতী হন তখন রবীন্দ্র প্রতিভাও মধ্যগগনে। রবীন্দ্রযুগে বাস করিয়া, তাঁহার দুর্ণিবার, সর্বতোগ্রাসী প্রভাবকে অস্বীকার করিয়া কবিরূপে তাঁহার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বিস্ময়কর, সন্দেহ নাই। যতীন্দ্রনাথের পূর্বে তাঁহার অগ্রজ কবিগণের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু একমাত্র আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি বিশিষ্ট দান রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মূলতঃ ভাবের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রানুসারী।

যতীন্দ্রনাথের প্রথম তিনটি কাব্যগ্রন্থ মরীচিকা (১৩১৭—২৯), মরুশিখা (১৩৩০—৩৪) ও মরুমায়ার (১৩৩৫—৩৭) মধ্যে তাঁহার মৌলিকতার পরিচয় আছে। আধুনিকতার কিঞ্চিৎ ছায়াপাত তাঁহার কাব্যে ঘটিয়াছে বটে কিন্তু যে লক্ষণ সমূহ দেখিয়া আধুনিকতা বিচার করা হয় তাহা তাঁহার মধ্যে নাই। তিনি দুঃখবাদী কবি; জীবনে সুখ অপেক্ষা দুঃখের আধিক্য বেশী, জীবন মৃত্যুশাসিত। জীবনের সর্বত্র জড়ের প্রাধান্য— এই জাতীয় তত্ত্বকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার কাব্যলোক নির্মিত হইয়াছে। তথাপি আধুনিকতার যে দুইটি বিশেষ লক্ষণ আছে, যথা জীবন সম্পর্কে হতাশা, অসন্তোষ ও তাহার চিরন্তন মূল্যবোধ সম্পর্কে তির্যক দৃষ্টিভঙ্গী এবং পরিশ্রমজীবী শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি গভীর মমত্ববোধ ও তাহাদের মুক্তি আন্দোলনকে উদ্দীপিত করিবার জন্য প্রেরণাদান, তাহাদের সামান্য ইঙ্গিত যতীন্দ্রনাথের আছে বটে কিন্তু পূর্ণ পরিচয় নাই। যে সময়ে তাঁহার প্রথম কাব্যগ্রন্থ রচিত হয় তখনও পর্য্যন্ত আধুনিকতার ঢেউ আমাদের দেশে আসিয়া পৌঁছায় নাই। যুদ্ধকে দূর হইতে আমরা দেখিয়াছি, সুতরাং তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া ও জীবন সম্পর্কে হতাশা আমাদের কাব্যে ধ্বনিত হয় না। তবে, মানবতাবাদকে আশ্রয় করিয়া সাধারণ মানুষ সম্পর্কে আমাদের সহানুভূতি জাগিয়াছে, যদিও কবিগণ কর্মে ও কথায় তাহাদের সত্য আত্মীয়তা অর্জন করিতে পারেন নাই। এই মানবতাবাদের পরিচয় আছে যতীন্দ্রনাথ; নজরুল ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যে।

যতীন্দ্রনাথের কাব্যে দুঃখবাদের পরিচয় আছে কিন্তু জীবন সম্পর্কে অবিশ্বাস ও নৈরাশ্যের কথা নাই। জীবনানন্দ দাসের কাব্যে যাহা পরিস্ফুট তাহা আধুনিক কাব্যের বিশিষ্ট মনোভাব বহন করে।

কোন দিন মানুষ ছিলাম না আমি।
হে নর, হে নারী,
তোমাদের পৃথিবীকে চিনিনি কোনদিন;
আমি অন্য কোন নক্ষত্রের জীব নই।

যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি। কালপুরুষ অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চীৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;
এই সব ভয়াবহ আরতি! [বনলতা সেন]

শূকরের চীৎকার, শূকরীর প্রসববেদনা প্রভৃতি প্রতীক বর্ণনার মধ্যে আধুনিক ক্ষয়িষ্ণু জীবনের রূপ প্রতিফলিত হইয়াছে।

কিন্তু 'যতীন্দ্র নাথ' 'ত্রিযামায়' লিখিয়াছেন ঃ—

আকাশ নিতান্ত নীল মৃত্যু মদিরায়
জীবনের নেশা কাঁপে তারায় তারায়।

সাধারণ মানুষের কথা, তাহাদের দুঃখ ও বেদনার কাহিনী ও মুক্তি আন্দোলনের ইঙ্গিত যতীন্দ্র নাথের কাব্যে আছে। 'শঙ্খ' নামক কবিতায় (সায়ম্) কবি লিখিয়াছেন

যেথা চিরক্রন্দিত সিন্ধুর তলে
বঞ্চিতদের সঞ্চয় চলে
শত শতাব্দ নিঃশব্দের
সহিত হৃৎ পঙ্ক,
সেথা সে নিভৃত ঘনান্ধকারে
সুর লক্ষ্মীর বন্ধনাগারে
অশ্রুভারে অতলান্তিকে
জন্মেছি আমি শঙ্খ।

চীরধারিণী ভিখারিণীকে ('ত্রিযামা') সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন ঃ

ভিখারিণী, কথা শোন
তুই যেরে তারি বোন।
প্রলয়ের জানিস সন্ধান।
ফেলে দে ফেলে দে টানি
ঘৃণ্য ওই চীরখানি,
ও লাজ নারীর অপমান।

দুঃখ যাহারা পায় তাহারা দুঃখ বিধাতার দূত। ভিখারিণীর মধ্যে প্রলয়ের আগুন সঞ্চিত হইতেছে। একদিন তাহার মধ্য হইতে বিপ্লব বহ্নি স্ফুরিত হইবে। এমনি দুঃখে একদা কটিবাস ফেলিয়া অট্টহাস্যে দিকবিদিক মুখরিত করিয়া শিববক্ষে পা দিয়া শ্যামা দাঁড়াইয়াছিলেন।

কপালের দুখ যত
অনল গিরির মতো
কপাল ভাঙ্গিয়া বাহিরায়।

তবে নজরুল ইসলামের মধ্যে (সর্বহারা) এই সুরটি অনেক স্পষ্ট ও তাঁহার বাণীও বিদ্যুৎগর্ভ।

মরীচিকা, মরুশিখা ও মরুমায়া, এই তিনটি নামও অর্থদ্যোতক। জীবন দুঃখময় বলিয়া কবি রুদ্রের পূজারী। তাঁহার উপাস্য দেবতা শিব কারণ তিনি চির দুঃখময়।

সুখ বাঁচে মরে, দুঃখ অমর— তুমি মৃত্যুঞ্জয়। ঋতুর মধ্যে আবাহন করিয়াছেন কবি চিরবৈশাখকে। এই বৈশাখ রুদ্রের ভয়ঙ্কর রূপ মনে আনে। বৈশাখের আনন্দ বহ্ন্যুৎসবের উচ্ছ্বসিতশিখায় প্রকাশিত হয়। নীহারিকাবুকে ইহার ঘূর্ণাছন্দ প্রতিফলিত, ইহার শঙ্খধ্বনিতে চিরসূর্য্যেরা অন্তরীক্ষে নব জগতের বীজ বপন করিয়া চলে।

আনন্দের সে অগ্নিমূর্ত্তি ভালবেসেছিনু বলে
মন উঠেনিকো এই বাংলার শ্যামল স্যাঁতানো কোলে।

কবির আকাঙ্খা ঃ যে এই চির বৈশাখ ঃ

ললাট বহ্নি বহিয়া আনিবে মৃত্যুঞ্জয়ী বর ?
ব্রহ্মাণ্ডের দাহন-গর্বে গরবী করিবে মোরে ?
এই ধরণীর পঙ্ক পিণ্ড নিম্নে থাকিবে পড়ে ?

যে তিনটি নাম তিনি নির্বাচন করিয়াছেন তাহার মধ্য দিয়া তাঁহার কবি ধর্ম সুপরিস্ফুট হইয়াছে। পৃথিবীতে দুঃখের মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া কবি নিদাঘ—মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। রুদ্রের পূজারী বলিয়া তিনি আনন্দের অগ্নি মূর্ত্তিকে আবাহন করিয়াছেন। মহামরুকে ভালবাসিয়া তিনি মৃত্যুঞ্জয়ী হইতে চাহিয়াছেন। যে জীবনের মধ্যে দুঃখের প্রাবল্য, সুখ যেখানে মরীচিকাবৎ তাহা 'অসহ্য বোধে চিরদিন আমি চেয়েছিনু বর্জন'।

দুঃখ দেবতার আসন জগতে প্রতিষ্ঠিত। এই দুঃখ জীবনকে নিপীড়িত করে। জীবনের পরিণাম মৃত্যু। একদা পৃথিবী ভস্মীভূত হইয়া যাইবে, থাকিবে শুধু শংকরের অনির্বাণ দুঃখের বহ্নিজ্বালা।

আজ ভাবিতেছি তাই —
সকল জ্বালার সব দীপ্তির পরিণাম শুধু ছাই।

কবির দুঃখতত্ত্ব তাহার 'ঘুমের ঘোরে' (মরীচিকা) ও দুঃখবাদী এবং নবপন্থা (মরুশিখা) কবিতাত্রয়ে পরিস্ফুট হইয়াছে।

জগৎ একটা হেঁয়ালি, তাহার মধ্যে নিয়ম অপেক্ষা আছে গোঁজামিল। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যা কবির মনে অজ্ঞাতসারে কাজ করিয়াছে। এই অনিয়মের জগতে আছে অন্তহীন দুঃখের প্রবাহ। কিন্তু যাঁহারা ভক্ত তাঁহারা ব্যাখ্যা করেন যে ভগবানের দেওয়া দুঃখ অতিমাত্রায় সূক্ষ্ম সুখ। আমরা স্রষ্টার লীলা বুঝিতে পারি না বলিয়া হা-হুতাশ করি। কিন্তু ইহাতে প্রাণের কান্না আমাদের থামে না। মানুষ দুঃখের প্রতিকার করিতে পারে না। সুতরাং নিরুপায় হইয়া ঈশ্বরকে পুরুষরূপে বা শান্তিরূপে বন্দনা করে। রবির আলো যাহারা পাইয়াছে তাহারা দিননাথের বন্দনায় মুখর হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু জন্মান্ধ যাহারা তাহাদের সূর্য বন্দনার কোন প্রেরণা আসিতে পারে না। ভগবদ্ বিধানকে প্রশ্ন করিয়া সূর্যের নিকট কবির প্রশ্ন ঃ

চেরা পুঞ্জির থেকে
একখানি মেঘ ধার দিতে পারো গোবি সাহারার বুকে ?

যুগে যুগে মহাপুরুষগণ ঈশ্বর প্রেরিত হইয়া নরনারীর শোক পাপ তাপ ও ব্যাধির নিরাকরণের উপায় প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু ঃ

যেমন জগৎ তেমনি রহিল, নড়িলনা একচুল ;
ভগবান চান আমাদের শুভ—একথা হইল ভুল।

দার্শনিক ও কবিগণ প্রচার করিয়াছেন যে জীবের চৈতন্য জড় বস্তুকে ক্রমশঃ পরাভূত করিয়া জয়ী হইতেছে। এই তত্ত্বের মাদকতা শক্তি মানুষের মনকে নির্জীব করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু জীবনের আদি ও অন্ত জড়ের প্রাধান্য। স্বপ্নের মত চৈতন্যের অস্তিত্ব অলীক বস্তু। স্বপ্নের ফেনার মত জড়-সমুদ্রে মানুষ ভাসিয়া বেড়ায়। জগতের শৃঙ্খলা তাই স্বপ্নের মত উপরে উপরে গোঁজামিল দিয়া তৈয়ারী। জগতের এত্রুটি বিচ্যুতিকে আমরা ভগবানের প্রেম দিয়া আড়াল করিতে চাই। কিন্তু

প্রেম বলে কিছু নাই—
চেতনা আমার জড়ে মিশাইলে সব সমাধান পাই।

প্রেম ও ধর্ম মিথ্যা কিন্তু বৃথা নহে। যদি কাহারও ব্যথা ইহার দ্বারা ঘুচিয়া যায় তবে তাহাকে বৃথা কেহ বলিবেনা।

স্রষ্টার জগতে অনিয়ম একমাত্র সত্য। পৃথিবী অন্ধ নিয়মে আবর্ত্তিত হইয়া চলিয়াছে। মৃত্যু জীবনের শেষ পরিণাম ইহাই যদি সত্য হয় তবে জন্ম পূর্বকাল কিংবা পরকালের চিন্তা করিবার কোন সার্থকতা নাই।

পূর্বকালে যা ছিনু আজ তার হয় না তো প্রয়োজন
পরকালেতেও যা হবে তা হবে—কেন বৃথা আয়োজন?

নিরুপায় মানুষ অদৃষ্টের সঙ্গে আপোষ করিয়া চলে। এই ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার উপায় মনের চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা। ইহার উপায় ঘুম। ‘এ ভব-রোগের সব চিকিৎসা আবার “ঘুমিওপ্যাথি”’। কবির বক্তব্য ঃ

চির নীরবতা চাই—
দোহাই তোমার, মাঝে মাঝে আর ঘুম ভাঙিওনা ভাই।

জীবনানন্দ দাস ক্লান্ত জীবনের ছবি এই ঘুমের প্রার্থনার মধ্যে আরও সুন্দর রূপে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

অরব অন্ধকারে ঘুম থেকে নদীর চ্ছল চ্ছল শব্দে জেগে উঠবনা আর;
তাকিয়ে দেখব না নির্জন বিমিশ্র চাঁদ বৈতরণীর থেকে
অর্ধেক ছায়া গুটিয়ে নিয়েছে
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিড়ি-নদীর কিনারে আমি শুয়ে থাকব—ধীরে পউষের রাতে—
কোন দিন জাগব না জেনে —
কোন দিন জাগব না আমি— কোনদিন আর [বনলতা সেন]

জীবনে আমরা যে সুখ ও সৌভাগ্যের অধিকারী হই তাহাও অপরের সুখের বিনিময়ে। বহুলোকের জীবনদীপ নির্বাপিত করিয়া আমাদের দীপালি উৎসব সুসম্পন্ন হয়।

ভরেছ আতর দানি,
কত প্রভাতের আধ ফোটা ফুল-মর্ম নিঙাড়ি ছানি?

কবিরা মিথ্যার ছবি আঁকিয়া চলেন। রূপনদীতটে বকুলতলীর ঘাটে তাহাদের সকাল হইতে সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়া যায়। কিন্তু যে অপরূপকে পাইবার জন্য তাঁহারা সাধনা করেন তাহা ব্যর্থ হয়। আপনার রূপকে বিনষ্ট করিয়া, আপনার দেহে পঞ্চ প্রদীপ জ্বালাইয়া অলক্ষ্য লক্ষ্মীর যে আরাধনা তাঁহারা করেন তাহা মিথ্যা। অসীমের শূন্যতা মরিচীকা রূপে আমাদের ভ্রান্ত করে। অসীমের কল্পনা ভ্রান্ত, মৃত্যুতেও জয় করা যায় না, দুঃখকে আত্মসাৎ করিয়া আনন্দের পরিচয় লাভ করা সম্ভব নহে। সুতরাং এই মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে কবি আহ্বান জানাইয়াছেন।

অসীমেরে তুমি বাঁধিবে সীমায় অচেনারে লবে চিনে;
নূতন নূতন কথার ছলনে মরণে লইবে জিনে!

মোহের আবরণ ছিন্ন করিয়া সত্যকে প্রকাশ করা প্রয়োজন। কবি তাই শ্লেষ করিয়া বলিয়াছেন ঃ

ধান ভানা ছাড়া কোন উঁচু মানে থাকেনা ঢেঁকির রবে! জীবনের রহস্য নহে, তাহার বাস্তব রূপকে প্রকাশ করা কবি কর্মের অন্তর্গত। জীবন-রহস্যের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহার অসীমতা ও ঐক্যরূপের অনুসন্ধানের চেষ্টা বৃথা। রহস্য আয়ত্তাতীত থাকিয়া যায়।

সকল সময়, রহস্যময়! তুমি রহ পাছে পাছে,
হে চির প্রহরী, তোমারেই প্রাণ বন্ধু বলিয়া বাঁচে।
বার বার জাগরণে,
যন্ত্রণা যত বাড়ে অবিরত তোমারেই পড়ে মনে।

স্রষ্টাও নিয়মের জালে আবদ্ধ, তিনিও অসীমের কারাগারে বন্ধী। তাই দুঃখের জীবনে তিনি আমাদের পরম বন্ধু। সমগ্র বিশ্ব একটি কয়েদখানা। ইহার মধ্যে সূর্য, চন্দ্র, বিচিত্র জীব সমূহ ‘উঠে পড়ে ছুটে, ঘুরে ঘুরে লুটে, কেবল ভ্রান্তি সার’। কাহারও মুক্তি নাই, কাহারও বিশ্রাম নাই। তবু নাই কারো ছুটি
অভ্যাস ঘোরে হাতড়িয়া মরে আঁধারেতে মাথা কুটি।
অসীমের কারাগার, —
যত যেতে যাও তত যাও, শুধু বেড়ার মিলে না পার।

নরনারী বন্ধন জর্জরিত। অসংখ্য জীব বন্ধন জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া আকুল ক্রন্দন করিয়া ওঠে। এই পৃথিবী রূপ কারাগারে যাহারা প্রহরী তাহারাও বন্দী, তাহাদেরও স্বাধীনতা নাই। অথচ বন্দী জীবনের দুঃখকে ভুলাইবার জন্য কত বিচিত্র আয়োজন। জীবন ও জীবন যাত্রা বিধিনির্দিষ্ট। জীবন, মরণ, কর্ম ও জ্ঞান পরনিয়ন্ত্রিত। ইহা হইতে মুক্তি প্রয়োজন। পৃথিবীতে জীব আসিয়াছে অপার দুঃখ জ্বালা সহ্য করিতে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে পৃথিবীতে মুক্তির দ্বার উন্মুক্ত। কিন্তু অদৃশ্য দুর্নিরীক্ষ অধীনতার জাল আমাদের ঘেরিয়া রাখিয়াছে। দাঁড়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ পাখীর ন্যায় আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভূত আয়োজন রহিয়াছে।

গাছে গাছে দাঁড় হাজার হাজার, দাঁড়ে দাঁড়ে দেওয়া ছোলা।
এ ব্যঙ্গ কিসে সহি?
কয়েদ যখন— ব্যবস্থা করো—কয়েদীরই মতো রহি।

স্রষ্টা নিজেও সৃষ্টির অন্ধ নিয়মে বন্দী। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব শুধু আকস্মিক নহে, নিরর্থক। বিভ্রান্ত, বিমূঢ় মানুষও প্রশ্ন করে “কোন্ অধিকারে আমারে সৃষ্টি করিলে জগন্নাথ?” সৃষ্টি বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ। স্রষ্টাও নিজে পরম দুঃখী। মানুষের মত তাঁহাকেও দুঃখ ভোগ করিতে হয়।

যে কবি প্রকৃতির দালালী করেন তিনি অর্থহীন কথার মালা গাঁথিয়া, দুর্বোধ্য তত্ত্বকথায় মানুষের মনকে বিভ্রান্ত করিতে চাহেন। নূতন কথা, নগ্ন সত্যকে জানাইবার মত সাহস কাহারও নাই।

অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁস বুনে তার মাঝে শুয়ে বল্ মশারির নেই আদি
মামুলি প্রেমের নেট্ মশারিটা টাঙিয়ে নে। অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।

‘মরীচিকায়’ যে দুঃখবাদ তত্ত্বটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহারই নবতর ব্যঞ্জনা ‘মরুশিখা’ ও ‘মরুমায়ায়’ দেখিতে পাই। চির দুঃখের দেবতা শিবের বন্দনায় ‘মরুশিখা’ শুরু হইয়াছে, চিরক্রন্দনময়ী গঙ্গার স্তোত্রে কাব্যের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে শিবের জটিল জটাজাল ঘেরিয়া গঙ্গার আর্তনাদ। জীবমৃত্যুর স্মরণ চিহ্ন রূপে শিব হাড়ের মালা পরিধান করেন, জীব দুঃখে কটিবাসও ত্যাগ করিয়াছেন। অন্যান্য দেবতা তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত কিন্তু তাঁহার আদি অন্ত নাহি অবসানা।

একদা পরম সহিষ্ণু এই দুঃখদেবতার ধৈর্যের বাঁধ যেদিন ভাঙিয়া যাইবে, সেদিন তাহার নৃত্যের ঘূর্ণাবর্তে প্রলয় সৃষ্ট হইবে।

সৃষ্টির প্রথম ধ্বনি ‘ওম্’। একদা অন্ধকার গর্ভ হইতে যখন বিশ্ব জন্মলাভ করিল সেদিন নিঃসহায় শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি চরাচর পূর্ণ করিয়াছিল। সাবিত্রী পৃথিবীর সেই ক্রন্দন সকল জীবে সঞ্চারিত হইয়াছে। আলোক পারাবার পার হইলে অপরূপ কালোরূপ প্রতিভাত হইয়া ওঠে। মাতৃস্বরূপিনী অন্ধকার সর্বব্যাপিনী।

আলোরূপী শিবে করি শব চরণে চাপিয়া
কালরূপী মহাকালী নৃত্যপরা নিখিল ব্যাপিয়া।
আঁখি মুদে
সে বলেছে কেঁদে,
তিমিরে তিমিরহারা সর্বনাশী তুমি মা আমার,
অন্ধকার, ওগো অন্ধকার।

মনোলোকে যে বেদনা নক্ষত্ররাজির মত প্রজ্বলিত, তাহার উপরে অন্ধকারের প্রশান্তি নামিয়া আসুক। ইহাই কবির আকাঙ্খা।

শব্দ স্পর্শ-রূপ গন্ধ-হীন
রসে ভরা তোমার পাথারে
হউক বিলীন
সত্তা মোর, মোর অহঙ্কার!
অন্ধকার, চির অন্ধকার ॥

'লোহার ব্যথা' নামক রূপক কবিতার মাধ্যমে পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ, নিপীড়ন ও শোষণের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। নিরুপায় মানুষ অত্যাচারের প্রতিবাদ করে, যথাশক্তি প্রত্যাঘাতও করে কিন্তু তাহাকে দিয়া শক্তিমান মানুষ তাহার স্বার্থ সিদ্ধ করে। শত্রু বলিয়া মানুষ একে অন্যকে আঘাত করে কিন্তু তাহার এই প্রতিহিংসার কোন কারণ নাই।

তোমার হস্তে ইস্পাত হয়ে সহি শান, পান, পোড়,
রামের শত্রু শ্যামে কাটে যদি, তাহে কিবা সুখ মোর?
তোমার হাতের যন্ত্র যাহারা দিনরাত মরে খেটে,
না বুঝে চাতুরী নেহাই হাতুড়ি ভাই হয়ে ভায়ে পেটে!

পৃথিবীতে প্রকৃতি তার মায়াজাল বিস্তার করিয়া রাখিয়াছে। সুনীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাস, বিমল নদীর জল, গাছে ফুল ও ফলে অলি— এই লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে লক্ষ্য যুগের সঙ্গীতে মাখা সুন্দর ধরাতল। স্বভাব কবিগণ এই সৌন্দর্যের গান গাহেন। কিন্তু অন্তহীন দুঃখ পারাবার ইহাতে সুখ বুদ্বুদবৎ ভাসিয়া ওঠে মাত্র।

ফাগুনে হেরি নবকিশলয় যারা আনন্দে ভাসে,
শীতে শীতে ঝরা জীর্ণ পাতার কাহিনী না মনে আসে,
ফল দেখে যার নাহি কাঁদে প্রাণ ঝরা ফুলদল লাগি,
তারা সভা কবি, আমরা বন্ধু, দুঃখবাদী বৈরাগী!

মায়াবিনী প্রকৃতির ছলনায় যাহারা বিভ্রান্ত হয় তাহারই হয় সৌন্দর্য্যের পূজারী। পশ্চিমের রাঙা মেঘ সত্য নয়, সত্য তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন বজ্র।

মিথ্যা প্রকৃতি, মিছে আনন্দ, মিথ্যা রঙিন সুখ;
সত্য সত্য সহস্রগুণ সত্য জীবের দুখ।

সভা কবিদের কাব্যে দুঃখের ইতিহাস মনোরম ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বের অন্তর্গূঢ় বিপুল বেদনা ঢাকিবার জন্য তাঁহাদের প্রয়াস দেখা যায়। কিন্তু সুখের ক্ষণিক প্রকাশ দুঃখের বিস্তীর্ণ ভূমিকার পরিচয় দেয়।

আছে গো আছে ও সুখ;
খদ্যোত বিনা দেখা যাবে কেন বনের আঁধার মুখ!

মাঝে মাঝে মৃগ তৃষ্ণিকা বিনা কে মাগে মরুর তৃষা!
আলেয়ার আলো নহিলে পান্থ কেমনে হারায় দিশা!

জীবনে যত দুঃখ, যত বেদনা তাহার দ্বারা নিষ্ঠুর দিগ্বিজয়ীর জয়মাল্য রচিত হয়। জীবনে ভাল অপেক্ষা মন্দের আধিক্য বেশী। তাই কবির প্রশ্ন স্রষ্টাকে;

বন্ধু, বন্ধুগো
ভাল চেয়ে হেথা মন্দ যে বেশী নাহি তো সন্দেহ।
আরও ভাল গড়া সম্ভব কিনা নহে আজ সে বিচার,
না যদি পারিবে, গড়িতে বন্ধু কি বা ছিল অধিকার?

মৃত্যুই জীবনকে মহিমা দান করে। মৃত্যুর আলোকে জীবনের ভাস্বরতা উজ্জ্বল হইয়া ওঠে। "সহস্র ধারায় ছোটে দুরন্ত জীবন নির্ঝরিণী মরণের বাজায়ে কিঙ্কিনী।" কিন্তু যতীন্দ্রনাথের মতে জীবন অপেক্ষা মৃত্যু অধিকতর সত্য। 'শ্মশানের ভস্মমাখা পরমা নিষ্কৃতি', ইহাই জীবনের তাৎপর্য্য। মৃত্যু ভয়ের কারণ সূত্রে জীবনের মালা গাঁথা।

সূত্র যেমনি টুটে,
ধূলায় ছড়ানো মালার টুকরো পাঁচভূতে লয় লুটে।

মৃত্যুর সৌধের উপরে আমাদের উৎসবের আয়োজন। ইহাতে মুদ্রিত-আঁখি রুদ্রকাল স্মিত হাস্য করেন। এই প্রেমায়ন মিথ্যা, বৃথা তাহার আয়োজন।

ভিটেয় ভিটেয় বসে আছে দেখি বাস্ত ঘুঘুর জোড়,
প্রেমের নেশায় রক্তিম আঁখি, ক্ষণিকের সুখলোর!
বিশ পুরুষের বিস্মৃতিতলে কাঁদে লাখো হাহারব,
তাহারই উপর সোহাগ কূজন, দুর্জনের উৎসব।
সে মরণ স্তুপে করি আহরণ জীবনের ছিটে ফোঁটা,
মিলন- পরশ-রস-রোমাঞ্চে ক্ষণে ক্ষণে হয় মোটা।

সিন্ধুতীরে দাঁড়াইলে আজিও মন্থনকে যেন প্রত্যক্ষ করা যায়। সমুদ্রের বিক্ষোভ, তাহার বিরামহীন গুরু গর্জন গান, চন্দ্রকে না পাইবার জন্য তাহার আক্ষেপ, নানা কবি নানা কারণ অনুমান করিয়াছেন। মন্থন আজিও চলিতেছে, ইহা সত্য। দুঃখ দেবতা ধূর্জটি বিশ্ববাসীকে আহ্বান করেন :

হাঁকে ধূর্জটী— কে কোথায় চির দুঃখনিশা বঞ্চিস্ ?
আয় আয় যত চির বঞ্চিত, এক সাথে করি পান
অমৃত-সিন্ধু-মন্থনোর্ত্থ দুর্ভাগ্যের দান!
হা হা হা হাস্যে মহা-সম্বরে সম্বরি জটাজাল
মহাগণ্ডূষে মহাকাল কূট মুখে তোলে মহাকাল!

তথাপি মন্থনের বিরাম নাই।

তবু মন্থন, চলে মন্থন, অযাচিত অকারণ
জীবসাথে শিব বিষ-নির্জীব কেবা করে নিবারণ?
তাই নিরুপায় চির হায় হায়, হে সিন্ধু, তব জলে
অমৃত প্রয়াসে যত ওঠে বিষ তত মন্থন চলে।

মর্ত্ত হইতে বিদায়ের পূর্বে, প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণ যাহা চিন্তা করিয়াছেন ও ব্যক্ত করিয়াছেন তাহাও জীবন রহস্য ও নরনারীর চিরন্তন দুর্ভাগ্যের ইঙ্গিত দান করে। দুঃখের পৃথিবীতে মানুষ

রচনা করে তাহার ক্ষণিকের স্বর্গ। অশ্রুজলে চিরশ্যাম হইয়া ওঠে ভূতলের স্বর্গখণ্ড। দুঃখ সে পায় তথাপি দেবতার পূজা করে। এই পূজার মধ্য দিয়া সে তাহার অন্তরের প্রীতি ও প্রেমকে প্রকাশ করে। অথচ ঃ

নরের হৃদয়ে হৃষিকেশ বসে যা করান তাই হয়।
বাহির মুখে পতঙ্গ-সম মানুষ কিছুই নয়।

মানুষের এই অন্তহীন দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের গাথা গঙ্গার চিরক্রন্দনের মধ্য দিয়া ধ্বনিত হইয়া চলিয়াছে। একদা বিশ্বের ক্রন্দন গোলোকাধিপতি নারায়ণকে বিচলিত করিয়া তুলিল, তাঁহার আঁখি অশ্রুপূর্ণ হইল। সেই অশ্রুধারা শিবের জটিল জটাজাল বাহিয়া নামিয়া আসিল ধরণীতে। সুতরাং নরনারীর অশ্রুধারা ভাগীরথীর প্রবাহ রচনা করিয়াছে। কত জননী গঙ্গাতীরে তাঁহাদের ক্রোড় শূন্য করিয়া দিয়াছেন। কত মর্মান্তিক হাহাকার ও বেদনা বক্ষে ধারণ করিয়া গঙ্গা অনন্ত জীব-ব্যথার মূর্ত্তিময়ী প্রবাহিনী রূপে বাহিয়া চলিয়াছে। গঙ্গা মৃত্তিকা দ্বারা মানুষ আরাধ্য দেবমূর্ত্তি গড়িয়া তাহার অজ্ঞাতসারে আপন বেদনার পূজা করে। মরুমায়াতেও (১৩৩৫-৩৭) বর্ণিত হইয়াছে চিবান্নহীন নবান্নদিনের কাহিনী। এই কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ কবিতা মুক্তি-ঘুম। মুক্তি-তত্ত্ব ব্যাখ্যায় স্রষ্টা বন্ধু কবিকে জানাইলেন ঃ

ঘুমাও ঘুমাও ভাই,
জীবনে মরণে কোনখানে কভু সত্য কল্প ব্যেপে,
ব্রহ্ম জপিছে মুক্তি মন্ত্র বিফলে কল্প ব্যেপে',
মুক্তি না পেয়ে ভোলা শংকর মাঝে মাঝে যায় ক্ষেপে।

সৃষ্টি অর্থই বন্ধন ও বন্ধন লীলাই একমাত্র সত্য। জগতে বন্ধনই একমাত্র সত্য। কোথাও মুক্তির কোন উপায় নাই।

রূপের অধীন দিব্য নয়ন, রেখার অধীন ছবি,
ছন্দ-অধীন স্বাধীনতা-গীতি, বন্দনাধীন কবি।

একমাত্র বিস্মৃতির মধ্যে আমরা বাস্তবের বেদনা ও দুঃখ ভুলিয়া থাকিতে পারি।

যে ঘুম ঘুমায়ে শংকর-আঁখি চির আধনিমীলিত,
যে ঘুমে পাগল সাগরের হাওয়া হয় গিরিগুহাহিত,
সেই ঘুম হ'তে এনে
তোর চোখে আজ দিলাম বন্ধু ছকু-খানসামা লেনে।

কবির বর্ণনায় ছকু খানসামা লেন বাস্তবের রূঢ় শ্রীতে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। আধুনিক কবিতার দুইটি বৈশিষ্ট্য এখানে পরিস্ফুট হইয়াছে। বারংবার ঘুমের প্রয়োজনীয়তার মধ্য দিয়া জীবনের ক্লান্তরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, ছকু খানসামা লেন আপন চরিত্রে উদ্ভাসিত হইয়াছে। 'হাটে' কবিতাতেও জনারণ্যের কেনা বেচার মধ্যেও কবি মাঠের বেদন ও জলের কাঁদনের অনুচ্চারিত ক্রন্দন শুনিতে পাইয়াছেন। সবজী বাজারে, ফলের দোকানে, মেছো হাটায় মর্মন্তুদ ইতিহাস কবি মনকে উদাসীন করিয়াছে। তাই ঃ

নির্জ্জন তটে চেয়ে নিরুপায়
শুধু হায় ঢেউ গুণি।

এক ছিল কন্যা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সন্ধ্যা হয়ে যায়। কমল আর অমল স্কুল থেকে এসে জলখাবার খেয়ে বেড়িয়ে ফিরে এলো। এবারে পড়তে বসবে। লাইট জ্বালিয়ে সন্ধ্যা প্রদীপ দিয়ে মায়ের পটের কাছে দাঁড়ায় আবার মৃগনয়নী। এই টুকুই বুঝিবা সম্বল। কমল মায়ের গম্ভীর মুখখানা লক্ষ্য করে।

তোমার কি অসুখ করেছে মা?

ওর শরীরে বড় মায়া। দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ন। মৃগনয়নী হাসবার চেষ্টা করে।—নাত? লন্ঠনটা নিয়ে চলে যায় কমল। অমল বসে বসে কাটাকুটি খেলছিল। বলে।—মাকে বলে দেব?

—কি বলবি।

—তুমি আজ স্কুলের হরতালের ভলেন্টিয়ার ছিলে?

—বলিসনি ভাই।

কমল আজ হরতালে ভলেন্টিয়ার ছিল। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে। গান্ধীজী গ্রেপ্তার হয়েছেন। চারদিকে পুলিসের অত্যাচার শোনা যাচ্ছে। স্কুল কলেজ হরতাল। কমল তাতে যোগ দিয়েছিল। অমল বলছে,— তুমি কেন পুলিসের লাঠির গোঁজা খেতে গেলে। যদি লাগত?

—কত মানুষের যে লাগছে জানিস। কত মানুষকে ওরা মারছে। তুই শুধু আমারটাই ভাবছিস।

—তা হোক। তোমার ও বন্ধুগুলো ভাল নয়।

—কোনগুলো?

—ওই যে ছেলেটা মাঝে মাঝে গান্ধীটুপি পরে। ভাল ফুটবল খেলে। ওকে কি মার মারলে আজ।

—তুই একটা গাধা। ওদের কত সাহস জানিস। পুলিসকে ওরা গ্রাহাই করে না। ওসব মারকে তোয়াক্কা করে না। অমল কিন্তু বলে,— ও সব তুমি আর করতে যেও না। কমলের ভাল লাগেনা ওর কথা। ওর এই ভীতু মনোভাবটা। বড্ড বিশ্রি। অমলটা কিযে হয়ে হয়ে যাচ্ছে দিন দিন! রেগে বলে।—আর বই বিক্রি করতে যাওয়াটা খুব ভাল বুঝি?

—নিজের বই নিজে বেচেছি। এতে খারাপটা কি করেছি?

অমল বেশ সোজাসুজি বলে।

—আর তুই যে সব ছেলেদের সঙ্গে মিশিস। স্কুলের সব চেয়ে ও'চা ছেলে তোর বন্ধু।

অমল মানতে চায় না।—ওরা একজামিনে কি করে দেখো।

—দেখিচি। সব টুকলিফাই চালাবে।

—কক্ষণো নয়।

—বাজে বকিস নি।

কমল বইটা খোলে। অমলও আর কথা না বলে বই খোলে।

মৃগনয়নী সদরের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রান্না করতেও ভাল লাগছিল না। রাত হয়ে এলো। এখনও ত' বনবিহারী এলো না। কি ব্যাপার? ইদানীং ত' এত রাত কখনও করে

না? তবে কি আবার—। ভাবতেই অনেকগুলো বছর আগের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে বনবিহারীর সেই বন্ধুর কথা। সেই মেয়েটার কথা। আরও কত অবিস্মরণীয় মুহূর্ত। কি হোল আজ! অন্য কোনদিন রাত করলে ভাবনা হোত না। কিন্তু আজ এমন একটা গুরুতর ব্যাপার রয়েছে অপিসে। হোল কি? আজ এত রাত করবার কারণ কি? সদর থেকে আবার রান্নাঘরে চলে আসে। ঠাকুরকে স্মরণ করে মৃগনয়নী। এ কি হোল! আসছে না কেন? তার কি জেল হাজত কিছু হোল? ধরে নিয়ে গেল অন্য কোথায়? কয়েক মাস যদি আর না ছাড়ে। আটকে রাখে জেলে? ঠাকুর ত' জানে ও চুরী করেনি! মিছিমিছি ওকে আটকাবে? একজনের দোষে আর একজনের শাস্তি। চোখদুটো ওর ভিজে ওঠে। আবার সদরের কাছে চলে আসে। কোন উপায়ও ত' নেই। কাউকে যে কোথাও পাঠাবে তারও কোন উপায় নেই। তবে এটা ঠিকই যে কোন খবর না পেলেও ভাসুরের বাড়ী খবর আনতে কাউকে পাঠাবে না। সংসারে ভাই যে ভাইয়ের এমন শত্রু হয়, এ কথা ও ধারণাও করতে পারেনি। তাই বা বলি কি করে। ভাসুর ত' খারাপ নয়। এই ভাসুর তাকে যত্ন করতও প্রথম প্রথম। কত মিষ্টি করে কথা বলত। নতুন বৌ আনবার পর সব ওলটপালট হয়ে গেল। এর কারণটাও ঠিক নতুন বৌ নয়। ভাসুরের দুর্বল-জায়গাটুকু আবিষ্কার করে ফেলেছে। তাই সুযোগ সে আর ছাড়ছে না। বনবিহারীর দুর্বল জায়গাটা মৃগনয়নী জানে। কিন্তু ভুলেও কখনও সেখানে আঘাত করে ন।। দুর্বলতার সুযোগ নেয় না। ওটাত একধরণের অত্যাচার। আকাশ-পাতাল ভাবতে ভাবতে রাত আরও বেড়ে যায়। ওপরের ঘরে এসে চুপ করে বসে ছেলেদের পড়া শোনে। সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ পাওয়া যায়। এসেছে বোধহয়। হ্যাঁ। এসেছে। নীরবে ঘরে ঢোকে বনবিহারী। একটুও টলে না। ছাই ভস্ম কিছু খায়নি তবে। মৃগনয়নী গামছাটা এগিয়ে দেয় নীরবে। কথা না বলে বনবিহারী জামা খোলে। কাপড় ছেড়ে গামছা পড়ে। আস্তে আস্তে কলকেটা নিয়ে তামাক সাজতে বসে। তামাক টানে অনেকক্ষণ ধরে চুপ করে। পিঠটা বেয়ে ঘাম ঝরছে। মৃগনয়নী রান্না ঘরে যায় একবার। আবার উঠে এসে বাতাস করে ওকে। তামাক টেনে কলঘরের দিকে যায় বনবিহারী।

এই ফাঁকে কমল আর অমলকে খেতে ডাকে মৃগনয়নী। ওদের খাওয়া হলে ওরা শুতে আসে ঘরে। বিছানা করে দেয় মৃগনয়নী। সবাই চুপচাপ। কেউই কথা বলছে না। বনবিহারী কলঘর থেকে এসে আসন পেতে বসে পটের সামনে। আহ্নিক সেরে নেবে। মৃগনয়নী বসে থাকে অমলের পাশে। আহ্নিক আর বনবিহারীর শেষ হয় না। একটু ভাল করে লক্ষ্য করে মৃগনয়নী। বনবিহারী দুচোখ বেয়ে গাল বেয়ে জল গড়াছে। পটের দিকেই তাকিয়ে আছে। মা মা বলে চীৎকার করে উঠবে বুঝি। মৃগনয়নীও ঠাকুরকে স্মরণ করে। অনেক পরে বনবিহারী ওঠে কাপড় পরে।

—খাবে না?

এই প্রথম কথা বলে মৃগনয়নী।

—চলো।

আবার চুপচাপ। চুপ করে মাথা নীচু করে খেয়ে ওপরে চলে আসে বনবিহারী। মৃগনয়নীর আর খেতে ইচ্ছেনেই। হাড়ি তুলে রান্নাঘরে তালা দিয়ে ওপরে আসে। বনবিহারী শুয়ে পড়েছে। মৃগনয়নী আলোটা কমিয়ে দেয়। আধা অন্ধকারে ঘরটা যেন আরও গুমট হয়ে ওঠে। একটুও বাতাস নেই আজ। হাত পাখাটা নামিয়ে নেয়ে বাক্সের ওপর থেকে। কমল আর অমলকে খানিকক্ষণ বাতাস করে। তারপর আস্তে আস্তে বনবিহারীর বিছানার কাছে আসে। বনবিহারী ঘুমিয়েছে কিনা বোঝা যায় না। বনবিহারীকে বাতাস করতে থাকে মৃগনয়নী।

—ঘুমোলে?—এই দ্বিতীয় কথা।

—না।—বনবিহারীর স্পষ্ট গলা শোনা যায়।

আবার নীরবে বাতাস করতে থাকে মৃগনয়নী। ভেবেছিল নিজে থেকেই বনবিহারী কিছু বলবে। কিন্তু বনবিহারী কিছুই বলে না। চুপ করে শুয়ে থাকে তেমনি।

মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করে।—কি হোল?

বনবিহারী নীরব।

মৃগনয়নী আবার বলে ফিসফিস করে।— কি হোল?

—চাকরীর?

—হ্যাঁ।

—ওটা গেছে।

হাতের পাখা বন্ধ হয়ে যায় মৃগনয়নীর। শরীরের ভেতরটা শিরশির করতে থাকে। ঠান্ডা ঠান্ডা লাগে হাত পা।

ভালই হয়েছে।—নিদারুণ সংযম নিয়ে বলে মৃগনয়নী।

একটা নিশ্বাস পড়ে বনবিহারীর,— হ্যাঁ। ভালই হয়েছে। মৃগনয়নীরও একটা বড় নিশ্বাস পড়ত; কিন্তু চাপতে পারে ও। সর্বশরীর ঘামতে থাকে। কি গরম পড়েছে আজ। গুমট্ গরম। একটু বলে কি বাতাস থাকতে নেই। তবু পাখাটা চালতে আর ইচ্ছে হয় না। হাত অবশ অবশ লাগে। ঘরে অন্ধকার বড় বেশী। যেন গ্রাস করছে অন্ধকার। ওঠে মৃগনয়নী। দিয়াশলাই জ্বালায়। দিয়াশলাইয়ের আলোতে দেখতে পায় বনবিহারীর মুখখানা। রোগা শরীরটা। বনবিহারীর জন্যেই কষ্ট। আজীবন হাড় ভাঙা খাটুনী খেটে গেল। পেল কি? আবার খাটতে হবে। কিন্তু খাটবার সুযোগ কি কেউ দেবে আর? লন্ঠনটা জ্বালায়। বনবিহারী একবার ফিরে তাকায়। কিছু বলে না। আলোটা একটু কমিয়ে আস্তে আস্তে দুছেলের মাঝ খানটায় এসে শুয়ে পড়ে মৃগনয়নী।

বনবিহারীর গলা শোনা যায়।—গিয়েছিলাম দাদার বাসায়।

মৃগনয়নী পাশ ফিরে তাকায়।

বনবিহারীর গলাটা ভাঙা,—বলে,— কথা বললে না।

—কথা বলবার মুখ থাকলে ত' বলব!

—নতুন বৌঠানের ভাইকে দেখলাম।

মৃগনয়নী আবার ওপাশ ফেরে বলে,— না গেলেই পারতে ওখানে। বনবিহারী আর কথা বলে না। মৃগনয়নীও নয়। কিন্তু ঘুম? ঘুম ভুলে গেছে ওরা। ভোরের অপেক্ষায় আছে।

তেইশ

একটা ভোর নয়। অনেকগুলো ভোর হয়। অনেক রাত পার হয়। বনবিহারী চাকরীর চেষ্টা করে। মৃগনয়নী হাসি মুখে একবেলা খেয়ে কাজ করে যায়। কমল আর অমল জানতে পারে সব। অমল ঠিক বোঝে না। ও এখনও আগের মতই এসে পয়সা চায় মায়ের কাছে। না পেলে চীৎকার করে। কমল সব শুনে একটু বেশী গম্ভীর হয়ে যায়। বাড়ীতে প্রায় কথাই বলে না। দিনরাত পড়াশুনো করে।

—কমলই ভরসা!

বনবিহারীও সায় দেয়।—ওকে মানুষ করতে পারলেই নিশ্চিন্ত হই। তবু আশায়! ওই একটুখানি প্রাণের ওপর নির্ভর। গেল মাসে ওপর হাতের দুটো গয়না বিক্রি করে দুশ টাকা পেয়েছিল। এ মাসের শেষের দিকটা আর চলতে চায় না যেন। শুধু ডাল আর ভাত। অমল মাঝে মাঝেই চেঁচায়। কমল একটা কথাও বলে না। ওর টেস্ট পরীক্ষা একেবারে সামনে। সেদিন সকালে উঠে মৃগনয়নী দেখে আর ডালও নেই। শুধু ভাত ও ছেলেদের সামনে কি করে দেবে। কি করে বনবিহারীর সামনে ভাত বেড়ে দেবে! শীত পড়েছে একটু। তবু ঘামে মৃগনয়নী। কমল পড়ছিল। ওকে ডাকে।

—শোন।

কমল উঠে আসে।

—গামছাটা নিয়ে একবার বাজারে যাবি?

বাজারের কথা শুনে একটু অবাক হবারই কথা। অবাকই হয় কমল। একটু ম্লান হাসে মৃগনয়নী।—বাজারে গিয়ে দেখবি যেখানে কপি বিক্রি করে, সেখানে কপির পাতা ফেলে দেয়। কিছু কপির পাতা যদি চেয়ে আনিস, কালজিরে দিয়ে কেমন সুন্দর চচ্চড়ি করে দোব দেখবি। কমল একটু হাসে।—দাও গামছা। গামছাটা ওর হাতে দিয়ে মৃগনয়নী রান্নাঘরের দিকে যায়। অমলকে দিয়ে চার পয়সা তেল আনতে হবে। আর একপয়সা কালোজিরে। বনবিহারী বেরিয়ে গেছে এক দোকানের মালিকের সঙ্গে দেখা করতে। চাকরী হবার সম্ভাবনা আছে সেখানে। লোকটি কয়েকদিন ঘুরোচ্ছে ওকে। অনেকটা দূর হেঁটে যেতে হয়। ট্রামে গেলেই ভাল হয়। কিন্তু পয়সা কই! বনবিহারীকে হেঁটে যেতে হবে। তাই একটু সকাল সকাল বেরিয়ে যায়।

বেলা অনেকটা হয়ে গেল। কমল ফিরছে না এখনও। অমলকে দিয়ে তেল আর কালোজিরে আনান হয়ে গেছে। ভাত নামিয়ে বসে আছে মৃগনয়নী। কমল ফিরছে না এখনও। মিছিমিছি কয়লা খরচা। উনুন থেকে কয়লা দুচারখানা তুলে রাখে মৃগনয়নী। ওপরে ওঠে মৃগনয়নী। শোনে অমল বলছে।—কি হোল দাদা কাঁদছিস কেন? বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে মৃগনয়নীর। তাড়াতাড়ি যায় বারান্দায়। কমল কখন ওপরে উঠে এসেছে, ও রান্নাঘরে বসে টের পায়নি। সামনে গামছায় বাঁধা কপির পাতা। চোখদুটো রাঙা কমলের। টস্‌টস্‌ করছে জলভরা।

—কি হোল রে? কখন এলি?

কমল কথা বলে না।

গামছা হাতে নিয়ে মৃগনয়নী বলে।—কেউ কিছু বলেছে?

—কি আর বলবে? বললে এগুলো গরু খায়। তোমাদের বাড়ীতে বুঝি গরু আছে? টপ্‌টপ্‌ করে জল পরে কমলের গালের ওপর।

মৃগনয়নী হাসে। এ হাসি কান্নার চেয়েও করুণ।

—এই কথা! এতেই এত!

কমল বই গুছিয়ে উঠে পড়ে। মৃগনয়নী সেই কপির পাতা ডাঁটা নিয়ে নীচে নেমে আসে। রান্নাঘরে এসে বঁটিটা নিয়ে বসে ডাঁটা থেকে শাকগুলো আলাদা করে। কমলের ছেলেমানুষিতে এমন হাসি পায় ওর! কিন্তু বুকের ভেতরটা জ্বলে যাচ্ছে কেন। অসম্ভব জ্বালা। যেন কতকগুলো জ্বলন্ত উনুনের কয়লা বুকের ভেতরে পুড়ছে। এমন ত' কখনও হয়! একি ওযে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। চোখে অন্ধকার লাগছে! স্নিগ্ধ মুখখানি একমনে ভাবতে থাকে মৃগনয়নী। তবে জ্বালাটা কমছে। অনেক কমেছে। ওই চোখের শীতল স্পর্শে ধুয়ে গেল যেন অনেক ময়লা।

কি গভীর প্রশান্তি! কি অপার অভয়!

—বাবা গো! আর যে পেরে উঠছি না!—অস্ফুট কন্ঠের উচ্ছ্বাস।

হু হু করে চোখের জল বেরিয়ে আসে মৃগনয়নীর। গাল ভেসে যায়।

রামতারণের চোখে তবু অভয়। তবু— কি শান্তি!

তাই ত' কতবার আমাকে বলত মৃগনয়নী। কত দিনই ত' গেল। কত দিন হাসলাম। কত দিন কাঁদলাম। একটা দিনও ত' রইল না বাবা! ওগুলো থাকে না। ওগুলোকে যদি লীলা বলে মেনে নিতে পারতাম সেদিন।

—কেন পারতেন না? জিজ্ঞেস করেছিলাম।

বলেছিল।— তখনও ত' বাবার সাধনা আমার ভেতর দিয়ে পূর্ণ হয়নি। আনন্দের আসন পেলে নতুন নতুন দিনের হাসি আর কান্না নতুন নতুন খেলা বলে মনে হয়, মজার লাগে। আবার একটু চুপ করে থেকে হাঁপ নিয়ে বলত,— সংসারটা বড়ই মজার বাবা!

স্তম্ভিত হয়ে ভাবি। মৃগনয়নী কোন আস্বাদের কথা বলছে। যে আস্বাদ পেলে দৈনন্দিন কান্না বেদনাগুলোও 'মধুর হয়ে ওঠে? মৃগনয়নীর জীবন বোধের সীমা খুঁজে পাই না। তাইত লিখছি মৃগনয়নীর কাহিনী।

এই সময়টার কষ্টটা মাঝে মাঝে সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যেত। কমলের চোখের জলটা ঠিকমত সয়ে উঠতে পারেনি মৃগনয়নী। তবু কোনদিন ত' চিরকাল পুরোণো হয়ে থাকে না। নতুন সংবাদ নিয়ে নতুন দিন আসে। বনবিহারীও একদিন সংবাদ নিয়ে এলো,— চাকরী তার হয়েছে। একটা বড় কাপড়ের দোকানে।

—কত দেবে?

—এখন পঁয়তাল্লিশ টাকা দেবে। তিনমাস পরে ষাট টাকা।

এমাসটা তবে চলবে কি করে।

বলে মৃগনয়নী।— এই চুড়ি ছগাছা বেচে এসো। তোমার মাইনে পেতে ত' একমাস দেরী।

মুখখানা ম্লান হয়ে যায় বনবিহারীর।— কিছুই ত' রইল না।

এইবার হাসি পায় মৃগনয়নীর।—কি যে বলো! তুমি রয়েছ, কমল অমল রয়েছে। আমার ত' সবই রয়েছে। এ ছাই গয়না আমার ভাল লাগে না। আমি পারি ও না।

গয়না বেচতে হয়। আরও একটা মাস কষ্ট করতে হবে। কমলের টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গেছে। তার পরীক্ষার টাকা জমা দিতে হবে। আর দুগাছা চুড়িও বোধহয় থাকবে না। না থাক। ওগুলো এই সব কাজে লাগলেই সার্থক। অগত্যা বনবিহারীকে আবার গয়নাই বিক্রি করতে হয়।

দিন ঠিকই কেটে যায়। মৃগনয়নী এখনও একবেলাই খায়। রাত্রে ভাত খায় না। কাউকে কিছু বলেও না। অনেক রোগা হয়ে গেছে মৃগনয়নী। মাঝে দুর্বল লাগে, মাথা ঘোরে। তবু হাসিটি ওর মুখ থেকে যায় না। আনন্দকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্তে। একটা দিন আনন্দ নষ্ট হলে মনে হয়। দিনটা আজ বৃথাই গেল। সেদিন সন্ধ্যের পর খেতে বসে অমল ডাল আর ভাত নাড়া-চাড়া করে। বেশী ভাত খেতে পারে না। মৃগনয়নী জিজ্ঞেস করে।—কিরে ভাত খাচ্ছিস না যে? কমল তাকায় না কারো দিকে মুখ নীচু করে ভাত খেয়ে যায়। অমল একবার কমলের দিকে তাকায়। তারপর বলে,— মা, শোন।

—কি বলনা?

—কাছে এসো না।

মৃগনয়নী কাছে আসে।

কানের কাছে মুখটা নিয়ে অমল ফিস্ ফিস্ করে বলে,—একদিন মাংস খেতে ইচ্ছে হচ্ছে মা!

—অ! এই কথা!— হাসতে গিয়েও হাসতে পারে না মৃগনয়নী।

কমল মুখ তোলে না। ওদের কথা যেন কানে যায়নি, এমনি ভাবেই খেয়ে যায়। খেয়ে উঠে আবার পড়তে বসবে। রাত দেড়টা দুটো অবধি। এমনি সামান্য সামান্য ব্যাপারে মৃগনয়নীর আনন্দে ভাটা পড়তে চায়। তবু কিছুতেই টলান যায় না।

জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে বলে।— তোর বাবা মাইনে পেলে মাংস আনব।

—সেত' অনেক দেরী।

—অনেক দেরী আর কই, বাবা! এই দু চারটে দিন গেলেই মাইনে পাবেন।

আর কথা বলে না অমল। ওরা ওপরে উঠে যায়। মৃগনয়নী চুপ করে বসে থাকে রান্নাঘরেই। ওপরে আর উঠতে ইচ্ছে হয় না। বনবিহারী আসবে অনেক রাত্রে। দোকান বন্ধ হলে। ভোরে বেরোয়। দুপুরে খেতে আসে। খেয়ে বোরোয় ফেরে অনেক রাত্রে। ছুটি নেই একটা দিনই। এই যে খাটুনি! ওই রোগা মানুষ এত খাটুনি কি সইতে পারবে? কে জানে? দোকান থেকে যখন ফেরে। মুখখানার ওপর একটা কালো আবরণ পড়ে যায় যেন। অত ফরসা মানুষটা, যেন পুড়ে আসে। আধঘন্টা বাতাস করতে হয়। জিরিয়ে তামাক খেয়ে তবে উঠতে পারে। খেয়ে শুতে শুতে রাত একটা। আবার ভোরে ওঠা। ভোরে উঠে মৃগনয়নী রান্নাঘরে; বনবিহারী দোকানে। কমল ওঠে রাত থাকতে। উঠে পড়তে সুরু করে। পরীক্ষার আর দেরী নেই। কমলের শরীরটাও ভেঙে পড়েছে। একটু দুধ খাওয়াতে পারলে ভাল হোত। একটা নিশ্বাস পড়ে মৃগনয়নীর। দুধের স্বপ্ন না দেখাই ভাল। বরং সকালে দুটিখানি করে ছোলা ভিজিয়েও যদি খায়! কাল থেকে তাই করবে মৃগনয়নী। বনবিহারী এলে আজ একবার বলে দেখবে। কিন্তু বলবার মত অবস্থা আর থাকে না। এত ক্লান্ত হয়ে আসে। একটা কথা বলতেও চায় না। মৃগনয়নীও বলে না। কিই বা বলবার আছে। বোবার মত চুপ করে সয়ে যাওয়া! বোবা মনে আর কথা ফোটে না।

চব্বিশ

খবরটা পেয়ে বেলা এগারোটার সময় একটা বড় মাছ হাতে করে দোকান থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছে বনবিহারী। এমন খবর জীবনে সাবাই কি পায়। কমল প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছে পরীক্ষায়। তাছাড়া চারটে লেটার। মানে, খুব ভাল পাস। বনবিহারীর মুখখানা বহুকাল পরে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বহুদিন পর হাসতে ইচ্ছে হয় খুব। খুব জোরে কথা বলতে ইচ্ছে হয়। যে দোকানের মালিকের সঙ্গে কথা বলতে ভয় পায় বনবিহারী। সেই মালিককে গিয়ে আজ বলে।—আজ একটু সকাল সকাল যাব।

—কেন?— চশমটা মুছে তাকান দোকানের মালিক।

—আমার ছেলে খবর দিয়ে গেল ও পাশ করেছে ম্যাট্রিক। চারটে লেটার পেয়েছে। বোধ-হয় টাকাও পাবে।

মালিক ওর বলবার ধরণে একটু থমকে যায়। তারপর বলে,—আচ্ছা, যাও।

—চারটে টাকা।

—আবার টাকা! আচ্ছা নাও। তোমার ছেলেটিকে একবার দেখিও।

মালিকের ইচ্ছে ও'র ফিপ্‌থ ক্লাসে দুবার ফেল করা ছেলেটাকে পড়াবার জন্যে যদি বনবিহারীর ছেলেকে সামান্য টাকায় বহাল করা যায়! কথাটা অবশ্য বনবিহারীর কাছে এখনই পাড়েন না। বনবিহারীর আড়াই টাকায় মস্ত একটা মাছ কিনে নিয়ে বাড়ী এসে হাজির। মৃগনয়নী আবাক। তবু মুখে কিছু বলে না। বনবিহারীর মুখখানা বেশ রাঙা দেখাচ্ছে আজ। কমলকে ডেকে সামনে বসায়। বলে,—তোর মাকে পেন্নাম করেছিস? কমল মুখটা নীচু করে মাথা নাড়ে।

—আয় কাছে আয়!

কমল আস্তে আস্তে কাছে আসে। কমলের রোগা পিঠখানায় হাত বোলায় বনবিহারী। স্বপ্ন নাকি সফল হয় না? আজ ওর স্বপ্ন সফল হয়েছে। পিঙ্গল চোখদুটো ওর চিক্‌চিক্ করে। মৃগনয়নী পাশে দাঁড়িয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসে।

বনবিহারী বলে,—ওকে আজ বেশী করে মাছ দিও। যত খেতে পারে।

—আর আমাকে?—অমল এগিয়ে আসে।

—তোকেও। — হো হো করে প্রাণ খুলে হাসে বনবিহারী।

ভাল করে তামাক সাজে। হুঁকোটা হাতে নিয়ে বড় আরাম করে তামাক টানে আজ। মৃগনয়নী মাছটা রাঁধবার ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত হয়।

—কমলির মাকেও কখানা মাছ দোব।

—দিও।—তামাক টানতে টানতে বনবিহারী চোখ বুঁজেই বলে।

—আর ভবানীর মাকেও কখানা—।

—দিও।

মৃগনয়নী অমলকে বলে,— একটু তেল আনতে হবে বাবা।

বনবিহারী বলে।— আমার পকেট থেকে একটা টাকা নিয়ে যা। যা লাগবে নিয়ে আয়।

অমল পকেট থেকে টাকা নিয়ে লাফাতে লাফাতে চলে যায়।

বনবিহারী বলে।—ওর জ্যাঠাকে প্রণাম করে আসবে না কি?

—না। ও বাড়ী গিয়ে কাজ নেই। খবর পরে জানতেই পাবে। সেধে জানাতে যাওয়াটা খারাপ হবে। একটু বাড়াবাড়ি হবে।

মৃগনয়নী বাধা দেয়।

বনবিহারী হাসে।— ঠিক বলেছ। তুমি না থাকলে আমি যে কখন কি করে বসতাম।

মৃগনয়নীও হাসে।

এক একটা দিনই যেন ভোর হয় শুধু অনেক হাসি নিয়ে। সেদিন শুধু হাসি আর আনন্দ। হোক না একটা দিন। হোক না মাত্র কয়েক ঘন্টা! এইটুকু হাসিই যেন সামনের আরও অনেকগুলো কাজ করবার শক্তি দেয়। অনেক সাহস দেয়। অনেক সহজ করে তোলে অন্তরকে। মৃগনয়নী আজ হাল্‌কা হয়েছে বটে, কিন্তু উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেনি। সংযমের তীর টুকু ওর ভেসে যায়নি খুসীর তরঙ্গে। তেমন অভ্যাস ত' ও এতদিন করে নি। উলটো অভ্যাসই করেছে। এক বাটি তেল এনে বনবিহারীর সামনে দেয় মৃগনয়নী।—নাও স্নান করে নাও। বনবিহারী চোখদুটো আধ বোঁজা করে তামাক টানছিল।

বলে।—যাই। তোমার রান্না হোল।

—রান্না ত' শুধু মাছ! ডাল ভাত আলু ভাতে ত' কন্নাই আছে।

—তাই বলে, মাছটা তাড়াতাড়ি রেঁধো না। একটু জুত্ করে রাঁধ।

মৃগনয়নী একটু হেসে নীচে নেমে যায়।

বনবিহারী ওঠে। তেল মেখে গামছা কাঁধে নিয়ে নীচে নামে।

যেতে যেতে শোনে অমল বলছে কমলকে।— ওঃ! দাদার কি আদর আজ।

কমল বলছে,—বাজে বকিস নি। হাসতে হাসতে নেমে যায় বনবিহারী।

স্নান খাওয়া সেরে ওপরে উঠে আসে ওরা সবাই। বনবিহারী পানটা চিবোতে চিবোতে তামাক টানে। চোখ দুটো আধ বোঁজা করে আয়াসে মৌতাতে।

—কমল। কমল বারান্দা থেকে আসে,—বাবা ডাকছ? অমলও আসে।

বনবিহারী বলে।— কাল পরশু আমার সঙ্গে একবার দোকানে যাবি। কমল ঘাড় নাড়ে।

—আমাদের বাবু তোর সঙ্গে একবার আলাপ করতে চেয়েছে। কমল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

—তুই ইংরেজীতে কথা বলতে পারবি? তাহলে ব্যাটা খুব জব্দ হয়।

নিজেই হাসে বনবিহারী, কমল ইংরেজীতে কথা বলবে এই গর্বে। দেখুক ব্যাটা মালিক সে একটা যা-তা মানুষ নয়!

কমল চুপ করেই থাকে। অমল বলে,—দাদা কি পড়বে জান বাবা?

—কি?

—কলেজে। আই, এস্, সি। মানে খুব শক্ত পড়া।

—হোক শক্ত! ওর কাছে আর শক্ত কি?— তামাক টানতে টানতে বলে আবার বনবিহারী।— কবে ভর্তি হতে হবে?

—সামনের মাসে।

—টাকা লাগবে কত?

—টাকা লাগবে না।— মাথাটা নীচু করেই কমল বলে।

বনবিহারীর চোখদুটো খুলে যায়।— টাকা লাগবে না কেন?

—ফ্রি শিপ্ পেয়ে যাব। তাছাড়া—।

—আবার কি?

—বইও ভাবছি জোগাড় করব কতক কতক।

—কোথা পাবি?

—দেখি!— কমল আর কিছু বলে না।

—কলেজের অন্য খরচা ত' আছে?—বনবিহারী বলে।

—কেন?— বনবিহারী বড় বড় চোখে তাকায়।

—তাও লাগবে না।

—মাসে দশটাকা করে বোধহয় স্কলারশিপ্ পাব।

—দশটাকা মাসে!

বনবিহারীর ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হয়, হাসিতে তামাকটা আজ কি মিষ্টি লাগে! পাতা মাদুরটার ওপর বেশ লেপটে বসে বনবিহারী। কমল আর অমল চলে যায়।

বনবিহারী স্বপ্ন দেখছে। অনেক রঙ, অনেক রঙীন। স্বপ্ন কি শুধু স্বপ্ন। না। কমল স্বপ্নকে সত্য করে তুলেছে। আজ তাই পঁয়তাল্লিস টাকার দরিদ্র সংসারেও স্বপ্ন দেখতে বাধা নেই। মনের রঙ ধরাতে আপত্তি কি?

ক্রমশঃ

দ্বীপান্তর

বিনয় হাজরা

এ গ্রহেরই দ্বীপ সে, বহুদূর সমুদ্রের মাঝে,
এ দ্বীপে-ও যুদ্ধ আছে, আছে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা,
এ সূর্য-ও আলো দেয়, প্রতিদিন সকালে ও সাঁঝে
এ দ্বীপে-ও কান্না আছে, আছে হাঁসি, হতাশা ও আশা।

হাজার বছর ধ'রে তবু সেতো রয়েছে অজানা!
এ যুগে কি আর কোন কলম্বাস জন্মাবে না আর?
যে পারে পেঁ'ছে দিতে এই অচেনা দ্বীপের ঠিকানা,
জাহাজ থামুক আজ, হাজার বছর সভ্যতার।

এ গ্রহেরই দ্বীপ সে, বহুদূর সমুদ্রের মাঝে,
চারপাশে অচেনা এক সুসভ্য মানুষের ঢেউ,
সভ্যতার কত ঢেউ, বহে যায় সকালে ও সাঁঝে,
কলম্বস আসে না তো, বলে নাতো তার কথা কেউ!

হে মানুষ দ্বীপ নয়, দ্বীপ নয় যন্ত্রপাতি রাখো,
এ্যাটমিক বোমা দিয়ে বাহাদুরি না-ই বা দেখালে
তার চেয়ে এসো আজ, একসাথে কাদা-বালি মাখো,
দূর দূর মেঘ-লোকে পাড়ি দিতে কেই-বা শেখালে!

হে যুবক, বলো নাকো এটা এক কুৎসিৎ মেয়ে,
ভালবাসো, এমেয়ে-ও ভাল হ'বে অনেকের চেয়ে।

ঝরণা বেগম

সামসুল হক

নীল চোখে কত বিষ : কতবার ময়নাদীঘির
জরিমাছ একডুবে কলমীলতার বেদনায়
ভেসে ওঠে : ঝরণা বেগম ঘাটে নীল চোখে স্থির :
একটি মালিনী-সাধ ঝুলে আছে চুলের খোঁপায়।

নীল চোখে কত নেশা : কতবার ঝড়ের দোপাটি
বুকে নিয়ে বেঁচে গেল : একটি শংখ-ঘুম তার
হাত ধরে নেমে এল—ঝুমকোলতার মত মাটি
ছোঁয়া দিয়ে তার পথ গন্ধে ভরালো একবার।

সেই তার শেষবার : এই ঘাটে নীল চোখ নিয়ে
দাঁড়াবেনা ঋতুগন্ধা সেই মেয়ে ঝরণা বেগম।
বৃষ্টির নূপুর শুনে কেউ যদি ডাক দেয় গিয়ে,
ভুল হবে : ভুল ক'রে পৃথিবীর ভাঙবে নিয়ম॥

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

লুভর

ইল্ দ লা সিতের দক্ষিণ প্রান্তে যেখানে স্যেন নদীর প্রসারিত বাহুদুটি মিলে গিয়েছে জলের সেই বিস্তারকে ডিঙিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পোঁদেজার সেতুটি। এই সেতুর বাঁদিকের মুখে দাঁড়ালে দেখা যায় নদীর অপর পারের কিনারা ধরে চলে গিয়েছে লুভ্রর প্রাসাদের গাঢ় ধোঁয়া রঙের একটানা ইমারত যার স্তরে স্তরে জমা হয়ে আছে ইতিহাসের কত কাহিনী—কত রাজন্য শক্তির উত্থান ও পতনের উচ্ছ্বাস, কত ব্যক্তি ও জনগত আশা ও হতাশার হৃদয়ের স্পন্দন।

দিনের পর দিন কর্মান্তে বেড়াতে গিয়ে নদীর ধারে বেঞ্চে বসে দেখতাম দিনের নিভে আসা আলোয় ঘোলাটে আকাশের পটভূমিকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে লুভ্র। এর সীমারেখা ধরে চোখ যেন দেখত কোন এক প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জানোয়ারের শায়িত মূর্ত্তি যা বার্ধক্যের জরায় শক্তিহীন এবং এর শেষ নিশ্বাস যেন যে কোন মুহূর্ত্তে নির্গত হয়ে গিয়ে একটা প্রাণহীন জড়ে পরিণত হবে।

রাস্তার আলোগুলি সহসা জ্বলে উঠলে মনে হয় তার গায়ের পুরু পর্দার খাঁজগুলিতে যেন কাঁপন লাগল। প্লেন গাছের চূড়ার উপরে দৃশ্যমান টাওয়ার ও চিমনিগুলি বাতাসে উড়ে যাওয়া কুয়াসার ফাঁকে ফাঁকে আলোর আভায় দেখলে মনে হয় যেন দুলছে।

ইল দ লা সিতের দ্বীপটিতে ছিল পারী শহরের আদি পত্তনী এবং এই ভিটেয় বাস করত "পারিসাই" জাতি যাদের পরিচয়ে এই নগরীর পরে নামকরণ হয়েছিল। রোমানরা এ অঞ্চলে পৌঁছাবার আগে একে বলা হত 'লুতেতিয়া'। নরম্যান্ডি, রাইন্‌ল্যান্ড ও ব্রিটানী থেকে পূবে দক্ষিণে অভিযান কারীদের কিংবা ইয়োরোপের দক্ষিণ-পূর্বের বাসিন্দাদের উত্তর-পশ্চিম সীমানায় পাড়ি দেবার চলতি পথের মাঝে পড়ত এই দ্বীপটি ও এর আশে পাশের এলাকা। অনেক সময় বন্যায় ডুবে যাওয়ার ফলে বিজয়ী রোমানরা ইল্‌দলা সিতের ডাঙা পরিত্যাগ করে নদীর বাঁদিকে ম' সাঁ জেনাভিয়েভের উঁচু টিলার প্রাসাদ ও সার্বজনীন স্নানাগার নির্মাণ করে শহর বানিয়েছিলেন। পরে ফ্র্যাঙ্ক সম্রাট ক্লোভিস্-এর আমলে (পঞ্চম শতাব্দি) গল্ রাজ্যে খৃষ্ট ধর্মের প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ দ্বীপটি ও তার পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে কয়েকটি ক্যাথেড্রাল্ ও প্রাসাদের প্রতিষ্ঠায় পারী একাধারে ধর্মসংঘশাসিত ও সম্রাটাধীন এক রাজধানীতে পরিণত হল। এর পর পরিবর্দ্ধিত ব্যবসা বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে নির্মিত প্রাসাদ হর্ম্যে সুশোভিত এই ঐশ্বর্যশালী শহরকে লুটে নিতে এল কত দুর্ধর্ষ জাতিরা এবং কেবল স্যেন নদীর আড়াল দিয়ে তাদের ঠেকান ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হওয়ায় কাপেত বংশীয় নৃপতি লুই অগুস্ত (ত্রয়োদশ শতাব্দি) পারীর চারিদিকে প্রাকার তুলে ঘিরে দিলেন। তিনি এর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে নদীর ডান দিকে নগর সংরক্ষার প্রহরী স্বরূপ একটি দুর্গ নির্মাণ করে তার নাম দিলেন "লুভ্র্"। তারপর অগুস্তুর এই দুর্গ পরবর্তী রাজাদের রুচি অনুযায়ী রূপান্তরে যোদ্ধা প্রহরীর চেহারা বদলে ক্রমে মনোরম প্রাসাদের সাজ নিতে শুরু করল।

ষোড়শ শতাব্দি থেকে ফরাসী নৃপতিরা এই প্রাসাদে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। রাজ-

সম্মান উপযোগী রাজপুরী নির্ম্মানার্থে ফরাসী নৃপতি প্রথম ফ্রাঁশোয়া লুভ্‌র্ এর পূর্ব আকারের সংস্করন ও নূতন অংশ নির্মাণ করেছিলেন। পূবদিকের অংশে তাঁর রাজত্বকালিন প্রবর্ত্তিত রেনেসাঁস স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য শৈলী নমুনা সগর্বে আজও অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে।

ফ্রান্সে প্রটেষ্ট্যান্ট্ দলের সূচনা প্রথম ফ্রাঁশোয়ার সময়ে দেখা দেয় এবং তাকে দলন করে নিশ্চিহ্ন করবার তিনি দৃঢ় ব্যবস্থা করেছিলেন। যদিও প্রটেষ্ট্যান্ট আন্দোলনের সূত্রে ছিল, পার্থিব ভোগ ঐশ্বর্য্য ও বিলাসেভরা ক্যাথলিক আরাধনায় কপট ধর্ম্মাচারের তীব্র প্রতিবাদ, কিন্তু ধর্ম্মের দোহাই-এ আপন স্বার্থন্বেষী রাজ-পরিবার ও পারিষদবর্গ পরস্পরের সংগে ষড়যন্ত্র ও সংগ্রামে লিপ্ত থেকে সারা দেশকে এক ভীষণ আলোড়নভরা ধ্বংসের যজ্ঞকুণ্ডে পরিণত করেছিলেন। রাজ্ঞী ক্যাথরিন মেদিভির আমলে লুভ্‌র্ এর অপরদিকে তুইলারি প্রাসাদ গড়ে উঠতে থাকে এবং এর ক্রমবর্দ্ধিত কলেবর রাজা চতুর্থ আঁরির সময় লুভ্‌র্-এর পাশে ভিড়েছিল।

প্রকাশ্যভাবে চতুর্থ আঁরি প্রটেষ্ট্যান্টদের প্রথা ছেড়ে ক্যাথলিক ধর্ম্মে দীক্ষিত বলেও তাঁর আসল ধর্মাসক্তি সম্বন্ধে সদা সন্দিহান ক্যাথলিক দলের একজন তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে লুভ্‌র্-এর অদূরে। রাজ্ঞী ক্যাথরিন-এর যে বিশেষ প্রবল কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম মত ছিল তানয় তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে নিজের রাষ্ট্র শাসন ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ ও সবল রাখা। তাই তিনি প্রতি বিপক্ষ দলকে পারস্পরিক ভাবে সমর্থন ও বৈরীতায় এককে অন্যের সংগে বিবাদ ও সংগ্রামে লিপ্ত করে তাদের সহজে ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

লুভ্‌র্-এর প্রাচীন অংশের অদূরে স্যাঁজেয়ারমাঁ লক্সেরোয়ার সুশোভন গীর্জ্জাটি। প্রাসাদের সামনে এবং গীর্জ্জাটির প্রাঙ্গনে সেন্ট বারথোলোমিউর দিনে ক্যাথরিনের আশ্বাসে আহূত ইউগোনোদের (প্রটেষ্ট্যান্ট) তাঁরই আজ্ঞায় নৃশংশভাবে হত্যা করা হয়েছিল। লুভ্‌র-এর বড় বড় থাম লাগান অলিন্দে দাঁড়িয়ে ক্যাথরিণ দ্য মেদিভি উপসংহার পর্য্যন্ত দেখেছিলেন এই নরমেধ যজ্ঞ। যদিও এই বিরাট হত্যার পিছনে না ছিল নীতি বা ধর্ম্মের কোন উচিত কৈফিয়ৎ, তদানিন্তন পোপ ক্যাথরিনকে ক্যাথলিক বিরোধীদের বিনাশের এমন নিখুঁত নিপুণ আয়োজনের জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন এবং লোকে যাতে এই ঘটনাকে আনন্দসূচক দিনের স্মৃতি হিসাবে মনে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তার জন্য বিশেষ স্মারক চিহ্ন সম্বলিত পদক তৈরী করে তার ব্যাপক বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই বর্বরতায় আপাত বিপক্ষের শ্রেণীতে দোষী বা নির্দোষী কাউকে বাদ দেওয়া হয়নি এবং গ্যাসপার কলিইনির মত স্থির ধর্ম্মী দেশাত্মবোধি বিচক্ষণ বীরকেও আপন চক্রান্ত সিদ্ধিতে বলিদানে ক্যাথরিনের একটু দ্বিধা ছিল না। মানুষের এই নীচ নৃশংসতার দ্রষ্টা ছিল লুভ্‌র-এর সামনের দেওয়াল ও থামগুলি, ঘৃণা ও লজ্জায় তাই বুঝি তারা আজও আত্মগোপন করতে চায় বিবর্ণ ও ধূসর আস্তরের অন্তরালে।

রাজা চতুর্দশ লুইএর নাবালক অবস্থায় তাঁর অভিভাবক হওয়ার ক্ষমতা লোলুপ রাজ-আত্মীয়দের মধ্যে কত ষড়যন্ত্র ও সংগ্রামের গুপ্ত ও প্রকাশ্য আয়োজনের অধিবেশন হয়েছিল এই প্রাসাদের ঘরে ও আঙিনায়। প্রাপ্ত বয়েসে লুই যখন শাসনভার আপন হাতে তুলে নিয়ে বিজয়গর্বে রাজধানীতে ফিরে এলেন সেই উপলক্ষ্যে লুভ্‌র-এর গ্রাঁ গ্যালারীর সুদীর্ঘ হলে যে নাচ গান ও ভোজের মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল তার আনন্দধ্বনির নিনাদে প্রাসাদের দেওয়ালগুলি প্রতিধ্বনির ঐক্যতানে নিরপেক্ষ ছিল না। লুভ্‌র্ প্রাসাদের অন্তরমুখী অংশে বহু থামে ভরকরা লম্বা একটানা যে বারাণ্ডা চলে গিয়েছে তার স্রষ্টা ছিলেন চতুর্দশ লুই।

রাজকীয় গৃহ সংগ্রাম ও ষড়যন্ত্রের বিরাট ঘটনা ছাড়াও অনেক ছোটখাট প্রহসন বা রাজা রাণী ও তাঁদের সমগোত্রীয় পারিষদের জীবনকেও এড়িয়ে যায় না তার কত দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল এই প্রাসাদের কত কক্ষে ও অলিন্দে। একদিন এই লুভ্‌র-এ লুই-এর সর্বসেনাধক্ষ্য মার্শাল তুরেন অতি ভোজন ও পান বসত শ্লথ শরীরকে একটু সজীব ও সবল করে নেবার উদ্দেশ্যে শয্যাবাসেই এক অলিন্দে দাঁড়িয়ে বায়ু সেবন করছিলেন। পিছন দেখে না চিনতে পেরে এক পরিচারক তুরেনকে তার বন্ধু পাচক ভেবে "কি জাঁ কেমন আছিস" বলে তাঁর পীঠে লাগিয়ে দেয় বিরাশী সিক্কার এক কীল। তিনি ফিরে দাঁড়াতে চিনতে পেরে অপ্রস্তুত, অপরাধী ও নতজানু ভৃত্য যখন তুরেনএর ক্ষমা প্রার্থনা করল তিনি শুধু বলেছিলেন,—কীলটি বেচারী জাঁর জন্যে হলেও বেশ শক্ত ও বেদনাদায়ক।

ফরাসী বিপ্লবে সামন্ততান্ত্রিক অংশগুলি বিলুপ্ত হওয়ায় পারী এই প্রথম সম্পূর্ণ সংযোজিত ও পরিপূর্ণ একটি শহরে পরিণত হয়েছিল। সম্রাট নাপলেয়ঁর শাসনাধীনে নিও-ক্লাশিক্যাল রূপায়নে রাজধানী পারী ছদ্ম পুরাতনের এক অভিনব সজ্জায় বিভাসিত হল। এযেন এক নূতন বিজয়দীপ্ত সিজার-এর উপযুক্ত রাজধানী এক নূতন রোম। নাপলেয়ঁর আওতায় শুধু যে বাইরের সাজে লুভ্‌র্-এর পরিবর্ত্তন হল তা নয় বিজিত দেশের শিল্পরত্ন সম্ভারে তিনি ভরিয়ে দিলেন এর সারা ঘরগুলি। আজ বহুজনে নাপেলেয়ঁকে অভিহিত করে পরধন লুন্ঠনকারী দস্যু বলে কিন্তু তাঁর দেওয়া শিল্প সম্ভারকে লুভ্‌র্ থেকে বাতিল করে দিলে অবশিষ্ট সংগ্রহ হয়ে যাবে ম্লান। সম্রাট তৃতীয় নাপলেয়ঁ নূতন প্রাসাদ ও উদ্যানের পরিকল্পনা ও নির্ম্মাণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। লুভ্‌র্ তাঁর রুচির প্রলেপে আর একটু পরিবর্ত্তিত, মার্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হল। তাঁরই নির্দেশে লুভ্‌র-এর গায়ে লাগা তুইলারি প্রাসাদের প্রসারিত অংশদুটিকে সংলগ্ন করে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছিল। পারী কমিউন-এর প্রকোপে তুইলারী প্রাসাদ দগ্ধ ও বিধ্বস্ত হয়ে যায় কিন্তু লুভ্‌র্ তৃতীয় নাপলেয়ঁর দেওয়া সাজে আজও সগর্ব্বে দাঁড়িয়ে আছে একইভাবে।

লুভ্‌র্ এর বাইরের সাজে যেমন রেনেসাঁস থেকে আরম্ভ করে নিও-ক্লাশিক ও পরবর্ত্তী মিশ্রশৈলীর প্রভাব দেখা যায় তার আভ্যন্তরিক অলঙ্করণেও তেমনি বিভিন্ন শৈলী ও রুচির নিদর্শন আজও বিদ্যমান আছে। অন্যান্য প্রদর্শিত শিল্পসম্ভারে দর্শকের দৃষ্টি সম্পূর্ণ আবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় কামরার গাত্রাভরণ ও অলঙ্করণের রূপ অনেকের নজরে পড়ে না। বেশীর ভাগ টুরিষ্টদের পারী দেখার মেয়াদ এক সপ্তাহ কি তার চেয়ে কম এবং বহু দ্রষ্টব্যের তালিকার মধ্যে অসংখ্য অমূল্য শিল্পরত্ন সমারোহময় লুভ্‌র্ মিউজিয়ামকে দেখতে হয় হয়ত কেবল একদিনে। এই মনঠকান শিল্প দেখার অভিজ্ঞতায় দ্রষ্টার মনে থেকে যায় হয়ত কেবল মোনালিসার হাসিমুখ, ভেনাস দ মিলো মূর্ত্তি ও আরও দু' একটা কিছুর আবছা স্মৃতি। কত দেশের কত শতাব্দির শিল্প নিদর্শন কত জাতির জীবনের সজীব ছবি দেখে পরিচয় করে নেওয়া যায় এই লুভ্‌র্এ যদি দর্শকের থাকে সময়, ধৈর্য্যও দেখে আনন্দ পাবার মত দৃষ্টি। এর এক গ্যালারীতে একদিন কাটালেও মনে জীবন্ত জেগে উঠবে বেশ কয়েকশত বছরের মানব সভ্যতা ও জীবন, এবং কতযুগের রাজধানীতে রাজপথে, প্রাসাদে, গ্রামে ও কুটিরে ভ্রমণ করা চলবে সাধারণ গৃহী ও গৃহিণীর অন্তঃপুরে তাঁদের জীবনের গোপন দৃশ্যে উঁকি দেওয়া যাবে অবাধে, কত শিল্পীর কর্ম্মশালায় বসে গুজবে মন প্রমোদাপ্লুত হবে।

লুভ্‌র্-এর গ্যালারীতে মধ্য যুগের ফরাসী গীর্জ্জার সমবেত কন্ঠে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে উঠে কোন রাজন্যের বিবাহে, সন্তানলাভে বা অন্ত্যেষ্ঠিক্রিয়া সমাধানে। কাঠ ও পাথরে সূক্ষ্ম কাজের ঝিলমিলি দেওয়া কুলুঙ্গী থেকে ম্যাদোনা, এঞ্জেল বা সেন্ট-এর সদা প্রসন্ন, শান্ত ও

স্বর্গীয় মুখচ্ছবি দর্শককে নিয়ে যায় মর্ত্তের ঊর্দ্ধে কোন আর এক অব্যক্ত জগতে। কোন মৃত নাইট-এর শায়িত মূর্ত্তি সম্বলিত সমাধির চারিদিকে শোকাবনত মঙ্ক ও নান্‌দের প্রার্থনারত রঙিন প্রতিমাগুলি জানিয়ে দেয় কত অভিযান ও বীরত্বের কাহিনী। অন্য কোন গ্যালারীতে মিশরের গ্রেনাইট্‌ পাথরে খোদিত অবেলিস্ক্‌, সার কো-ফেগাই, স্ফিংকস্‌ এবং পশু ও মানবাকৃতির মিশ্রিত রূপে দেবদেবীর নানাবিধ মূর্ত্তি, পত্নী পুত্র কন্যা সমভিব্যাহারে দোর্দণ্ড-প্রতাপান্বিত ফ্যারাওগণ, প্রাসাদের পারিষদ ও কর্মচারিবৃন্দ, পিরামিড্‌-এর মৃতপুরীর অন্ধকার ছেড়ে এই নূতন জগতের সামনে কত সুদূর অতীতের পুরাতন জীবনের পুনরাভিনয় করে চলেছে। কান পেতে শুনলে এই মূর্ত্তিগুলি থেকে হয়ত শোনা যায় কত অগণিত বিজিত বন্দী দাসের কশাঘাত নিস্কাষিত আর্তনাদ, ব্যথা ও শ্রমক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস ও অস্বাভাবিক আসন্ন মৃত্যুতে হৃদয়ের শেষ আক্ষেপধ্বনি। কোথাও বা স্বর্ণ-রবি-করোজ্জ্বল গ্রীসের অলিভকুঞ্জে ক্রীড়ারত সুঠাম যুবক ও যুবতীরা যেন মায়ায় সহসা থেমে গিয়েছে পাথরের মূর্তিতে ফাইদিয়াস, প্রাক্‌সিতেলস মাইরন কি পলিক্লিতাসএর করস্পর্শে। প্যান-এর বাঁশীর সুরে নৃত্যের ছন্দ-ভঙ্গিমা দুলে ওঠে কত ভেনাসের পেলব দেহে। সে বাঁশীর তালের অনুরণন যেন ঝংকৃত এ্যাপোলোর হাতে লিউট্‌-এর তন্ত্রীতে আর তাঁর ব্যায়ামপুষ্ট পৌরুষেগর্বিত দেহের পেশীগুলি স্পন্দিত হয় সে সঙ্গীতের তালে মানে। কত রোম্যান রাজ্ঞী নৃপতি, নাগরিক ও নাগরিকারা পাথরে মূর্ত্ত হয়ে ভোগ লালসাময় স্বৈরাচারী জীবনের ছবিকে তুলে ধরেছেন অপূর্ব-শৌর্য্য ও বীর্য্যের স্মৃতির পাশে পাশে।

মাইকেল এঞ্জেলোর করা বন্দীদাসের দুমড়ে পড়া মূর্ত্তি-দুটিতে যে বেদনা মূর্ত্ত দেখা যায় কে জানে হয় তা শিল্পীর জীবনে যে বিরাট পরিকল্পনাগুলি প্রকাশের সম্ভাবনা পাইনি এরা তারই এক জমাট ব্যর্থতার অভিব্যক্তি।

আদি খৃষ্টিয় চিত্রাবলীতে চিমাবুয়ে ও জিয়োত্তোর কত মাদোনা ও যেসাস সোনালী আকাশের দৃশ্য পটে দাঁড়িয়ে দ্রষ্টার মনকে অভিভূত করেন। ফ্রাঞ্চেস্কা, বত্তিবেলী, দাভিঞ্চি, এঞ্জেলো,, রাফায়েল্‌, কারাভাগ্গিয়ো, লাতুর, পুস্যাঁ, ভাতো, হাল্‌স, রেমব্রান্ট, ভারমিয়ের, এল্‌ গ্রেকো, ভেলাথ্‌ কুয়েথ, গোয়য়া, দাভি; দোলাক্রোয়া, এ্যাঁগ্র, ম্যানে, মনে, সেজান, দোগা, ভ্যান হফ্‌, গগ্যাঁ এবং আরো কত শত ইয়োরোপের শিল্পী-প্রমুখরা রেখে গিয়েছেন তাঁদের চোখ আর মনের ফাঁদে ধরা দুঃখ, সুখ, ত্যাগ, বিলাস, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্পনা ও জল্পনার কত ছবি ও কত বিচিত্র রূপ।

আলোচনা

সম্যক

বর্তমান আলোচনা নতুন কিছু নয়, সত্যসন্ধান এতে আছে কিনা বলা যায় না। শুধু বলা যায় বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার শাখাটি অপরিপুষ্ট, এবং তার কারণ—আলোচনায় ‘সম্যক’ এই নীতিটি যথাযথ অনুসৃত হয় না। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ‘সমালোচনা সাহিত্য’ গ্রন্থের ভূমিকায় আশাব্যঞ্জক স্বীকারোক্তি করেছেন। তিনি বলেছেন, বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার শাখাটি কবিতা গল্প উপন্যাস ইত্যাদির মত পরিপুষ্ট যদিও নয় তবু এটি কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে উপনীত হয়েছে। যৌবন শব্দটির ব্যবহার একটি বলিষ্ঠ সম্ভাবনা সূচিত করে। অক্ষয়কুমার দত্তের মতে, যৌবন অতি বিষম কাল। যৌবন মানুষকে যতখানি সম্ভাবনাময় করে, তার মধ্যে মহনীয়তার বীজ যতখানি উপ্ত থাকে, স্খলনের সম্ভাবনাও তার মধ্যে সমধিক। চারিত্রিক বিশুদ্ধি বজায় রাখার ওপর ভবিষ্যত সম্ভাবনা কতটা ফলপ্রসূ হবে তা নির্ভর করে। বাঙলা সাহিত্যে সমালোচনার শাখা যদি শ্রীকুমার বাবুর মতে যৌবনে উপনীত হয়ে থাকে তবে অক্ষয়কুমারের আশঙ্কার কথা স্মরণ রেখে তাকে ‘সম্যক’ নীতি স্নাত করে চারিত্রিক শুদ্ধি বজায় রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।

সাহিত্য সম্পর্কে শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের শেষ কথা কালকে জয় করে চিরন্তন হওয়া। সহস্রাব্দ অতীত হওয়ার পর মহাকাব্যে আজও আমাদের রসপিপাসা চরিতার্থ হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে তবু কালিদাস, শেক্সপীয়রের রচনা মানুষকে আনন্দ দিচ্ছে। এটি একটি ঘটনা। কেন হয়েছে বিশ্লেষণ করলে হাতে হাতে অঙ্ক মিলিয়ে দেবার মত কোন সদুত্তর কারো পক্ষে দিতে পারা শক্ত। সমালোচক যদি সমসাময়িক হন তাঁর পক্ষে কোন রচনা চিরন্তন হবে কিনা এ ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভবপর নয়। কোন রচনা ভবিষ্যতকাল বরণ করে নেবে কি না এ কথা কেউই যেমন বলতে পারে না সমালোচকও পারেন না। কোন প্রকার অনুমান এমন ক্ষেত্রে বিপর্যয়কর। চিরন্তন কোন সাহিত্য হবে তা আমরা বলতে না পারলেও চিরন্তন হয়েছে এমন সাহিত্য থেকে আমরা বিচারপূর্বক কয়েকটি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য আবিষ্কার করে সাহিত্য কেমন হলে চিরন্তন হতে পারে তার আন্দাজ পেতে পারি।

মানুষের লক্ষ্য আনন্দ। সে আনন্দের পথে ছুটে চলেছে— এই চলার গতিই জগৎ। ‘হেথা নয় হোথা নয় অন্য কোথা অন্য কোনখানে’। আনন্দের জন্যেই এ জগত চলেছে বলা যেতে পারে। জগতে প্রত্যেকেই আনন্দের অভিলাষী। চরম এবং পরম আনন্দের সন্ধান আমরা জ্ঞানে বা অজ্ঞানে করে চলেছি। সাহিত্যের উদ্দেশ্যও আনন্দলাভ। সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনায় সাহিত্য সোপান আরোহনে আনন্দলাভ সম্ভব—রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীদের কাছে একথা আমরা সবাই জেনেছি। যে সাহিত্য যত সত্য-শিব-সুন্দরের সামীপ্যলাভ করেছে সে সাহিত্য তত আনন্দপ্রদ। আর একটি বিষয় হল আদর্শ। কোন আদর্শহীন সাহিত্য চিরন্তন হতে পারে নি। আদর্শহীনতা নিয়ে রচিত হলেও তা অযথার্থ হিসেবে যদি বিবৃত না হয় তবে তা চিরন্তন হতে পারে না। লরেন্সের যে উপন্যাসখানি সর্বাধিক আলোচিত বলে প্রচার করা হয় তার সমস্ত আলোচনা স্তব্ধ

হয়ে যায় যদি কোন যথার্থ বোদ্ধা সমালোচক বলে দেন দুই দুই এর যোগফল পাঁচ যে ভুল লেখক সেই সত্যের নির্দেশ দিয়েছেন।

কয়েক বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যিনি উপাচার্য ছিলেন তিনি খুব কড়া বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এর কারণ তার আমলে সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার অত্যন্ত কমে যায়। এ খ্যাতি প্রমাদপূর্ণ। যার দশ পাওয়া উচিত তাকে কখনই এগার দেওয়া হবে না যদি নিয়ম করি তবে যাতে কিছুতেই তাকে নয় দেওয়া না হয় তাও অবশ্য দেখতে হবে। কঠোর পক্ষপাতহীনতা ন্যায্যপ্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করাকে বলে না। পক্ষপাতহীন হলে কেবল সুবিধে না দেওয়া নয় অসুবিধে না ঘটানও লক্ষ্য হওয়া উচিত। উক্ত উপাচার্য বেশী নম্বর যাতে দেওয়া না হয় তার ওপর যতটা চাপ দিয়েছিলেন কম যাতে না দেওয়া হয় তার ওপর ততটা চাপ দেন নি ফলে অনিবার্যভাবে অনুত্তীর্ণের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল। সুতরাং কঠোর তাঁকে বলা চললেও পক্ষপাতহীন বলা চলে না। কঠোর সমালোচক বলে অনেকের খ্যাতি আছে। তাঁদের খ্যাতি উপরোক্ত উপাচার্যের খ্যাতির মত কি না ভেবে দেখতে বলি। পক্ষপাতহীনতা সমালোচকের প্রথম ও শেষ গুণ। যাঁর তা নেই তিনি নিজেকে যেন সমালোচক ছাড়া আর যা খুসী বলেন।

সমালোচনা বলতে সাধারণ যে ধারণা প্রচলিত আছে তার একমাত্র অর্থ নিন্দা। আমাকে নিন্দা করার তোমার কোন অধিকার নেই— এই কথাটা বলতে চেয়ে নিন্দার পরিবর্তে সমালোচনা কথাটা ব্যবহার করেন শতকরা বোধহয় নব্বই জন বাঙালী। প্রশংসা করাকেও সমালোচনা বলেন শতকরা ষাট জন বাঙালী। বইটার সমালোচনা পড়লাম খুব প্রশংসা করেছে। কিন্তু কেন করবে? প্রশংসা করা ত সমালোচকের কাজ নয়। স্তুতি বা নিন্দা সমালোচনা নয়। স্তুতি বা নিন্দা নয় তবে সমালোচনা কি? পক্ষপাতহীনতা। সমালোচক কেবল সত্যনির্ণয় করে দেবেন। দুই যোগ দুই চার হয়ে থাকলে বলবেন, ঠিক দেখিয়েছে সত্য হয়েছে; দুই যোগ দুই পাঁচ হলে বলবেন ভুল দেখিয়েছে সত্য হয়েছে। ব্যস, আর কিছু নয়। নিন্দা বা প্রশংসা করবে পাঠক, তার নিজের রসবোধ ও রুচি অনুসারে। আমার ভাল লাগবে কি মন্দ লাগবে তা অপরে ঠিক করে দেবে নাকি? পরের মুখে ঝাল ত কোন ছার সন্দেশই বা খেতে চায় কে!

সাহিত্যানুরাগী মাত্রেই জানেন সম্যক আলোচনাকে সমালোচনা বলে। সম্যক নীতিটি বজায় না রেখে হয় নিন্দা না হয় প্রশংসা পাঠকজনোচিত এই মনোভাব নিয়ে সমালোচক সাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। বাঙলায় সমালোচনা সাহিত্যের অপরিপুষ্টির এইটিই মূল কারণ। যে সব সাহিত্য চিরন্তন সে সব সাহিত্যের সার্থক সম্যক আলোচনাও চিরন্তন। শেক্সপীয়র যাঁরা পড়েন ব্র্যাডলী তাঁদের নিত্য সাথী। কবি প্রতিভা শুধু নিজে কালজয়ী হয় না সেই প্রতিভার সমালোচককেও কালজয়ী করে। কালিদাসের নাম যতদিন থাকবে মল্লিনাথের নাম সুধী মানসে স্থান পাবে। সমালোচকের প্রধান গুণ তিনি বোদ্ধা। শুধু নিজে বোদ্ধা নয় অপরকে সাহিত্যের মর্মবাণী শোনান ও বোঝান তাঁর কাজ। গৃহশিক্ষক এবং অভিধান এই দুয়ে মিলে সমালোচক।

জলে তৃষ্ণা মেটে। ভাল মন্দ যে কোন জলেই মেটে। মন্দ হলে পরিশোধন করে ব্যবহার করি। স্বাস্থ্যধর্ম রক্ষিত হয়। আবহমান কাল সাহিত্যে নীতি নিয়ে লড়াই চলে আসছে। বঙ্কিমকে শরতের আমলে নীতিবাগীশ বলা হত। আজ আমরা ঠাণ্ডা মাথায় দেখতে পাচ্ছি শরৎও নীতিহীনতাকে প্রশ্রয় দেন নি। নীতিবাগীশ শব্দটি শ্লেষাত্মক। শুচিবায়ুগ্রস্ত গোছের একটা অর্থ বোঝায়। কিন্তু আমরা দেখেছি চিরন্তন প্রতিটি সৃষ্টিই আদর্শমণ্ডিত। আদর্শহীনতা যদি প্রতিপাদ্য হয় তা হলেও সেটা ভুল এই ভাবেই প্রতিপাদন করা হয়েছে। নরক দেশভ্রমণের পক্ষে

একটি প্রশস্ত স্থান এবং মিথ্যাকথার পাথেয় ব্যতিরেকে সেখানে যাওয়া যায় না এইটে বোঝবার জন্যে যুধিষ্ঠিরকে নরকে নিয়ে ফেলা ব্যাসদেবের প্রতিপাদ্য ছিল না। একটি মিথ্যেও যে মিথ্যে সারাজীবন সত্যানুসরণ করে একটি মিথ্যে বললে সেটি যে সত্যের ফাউ হিসেবে গণ্য হয় না, একবার যুধিষ্ঠিরকে তার জন্যে নরক দর্শন করিয়ে ব্যাসদেব সত্যনিষ্ঠারই জয়গান করেছেন। স্বামীর কাছ থেকে পালাবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই এমন স্ত্রীকে রাবণ হরণ করেছিলেন: এটা রামচন্দ্র, সীতাদেবী, বাল্মীকি এবং আমরা সবাই জানি— কেবল তখনকার অযোধ্যাবাসীগুলো সে কথা বোঝেনি। রাম সম্রাট ছিলেন। প্রজাদের ঠেঙিয়ে নাম ভোলাতে পারতেন, কর বাড়িয়ে দিতে পারতেন, পত্নী প্রেমে রাজ্যত্যাগ করে চলে যেতে পারতেন। কিন্তু বাল্মীকির কালজয়ী হওয়ার ইচ্ছে ছিল তাই তিনি সীতাকে বর্জন করিয়েছেন। বৌ পালানই বিধি এমন সত্য প্রচারিত হলে অগ্নি, শালগ্রাম, প্রজাপতি, রেজিষ্ট্রার, হিন্দু কোড বিল কেউই সাংসারিক বা মানসিক শান্তি বজায় রাখতে পারবে না। মহাকাব্য অত্যন্ত বিরাট বস্তু তার উদাহরণ বাদ দিলাম। ডানকান হত্যার পর ম্যাকবেথের চেহারা ভাল হয়ে গেল, লেডী ম্যাকবেথ নেচে গেয়ে বেড়াচ্ছেন এমন কথা শেক্সপীয়র ঠাট্টাচ্ছলেও বলেন নি। পৃথিবীতে যদি কোনদিন একটি চোরও কখন বলে যে সে জীন ভ্যালজীনকে দেখে চুরি করা শিখেছে তবে সেইদিনই পৃথিবীতে সাহিত্যের ইতিহাস থেকে ভিক্টর হুগোর নাম মুছে যাবে। নীতিহীনতাকে সমর্থন করে আদর্শ ভ্রষ্টতার জয়গান গেয়ে কোন সাহিত্য চিরন্তন হয় নি। আদর্শভ্রষ্টতার কথা যেখানেই আছে সেখানে লেখক সূর্য পশ্চিমদিকে ওঠা ঠিক বলছেন কি না আমাদের সেইটুকু দ্রষ্টব্য। সমালোচক সেটি নির্ধারণকল্পে পরিশোধন করে দেবেন। পরিশোধনের পর সাহিত্য পিপাসা চরিতার্থ করলে আর মনের স্বাস্থ্যহানির আশঙ্কা নেই। সমালোচক পরিশোধক।

সুতরাং 'চরিত্রহীন' নিয়ে যদি বিতণ্ডার সৃষ্টি হয় এবং তাতে দুটো দলের উদ্ভব ঘটে, একদল বিভিন্ন যুক্তি দিয়ে 'চরিত্রহীন'-কে ভাল বলেন, অপরদল খারাপ বলার দুশটা যুক্তি দেখান, তার মধ্যে কোন সমালোচক যেন কোমর বেঁধে নামতে না যান। যে চাদরে কোমর বাঁধবেন সেই চাদরে নিকটস্থ আলোকস্তম্ভে উদ্বন্ধন শ্রেয়। ওকালতী তাঁর কর্ম নয় তিনি অঙ্কের উত্তরপত্রের পরীক্ষক। ভাল বা মন্দ বলার ক্ষীণতম চেষ্টা তাঁকে পক্ষপাতহীনতার আদর্শচ্যুত করবে। সাহিত্যে চলিত ভাষার যখন প্রথম প্রচলন হয় রবীন্দ্রনাথ কথ্যভাষাকে সাহিত্যের বাহন করার স্বপক্ষে ছিলেন। মোহিতলাল মজুমদার 'বাঙলা সাহিত্যের ভাষা' নিবন্ধে এ বিষয় একটি আলোচনা করেন। তাতে তিনি রবীন্দ্রনাথের উক্ত মত সমর্থনের সমালোচনা করেছেন, সম্যক আলোচনাই করেছেন। তাঁর একটি যুক্তির কথা মনে পড়ছে,— "রবীন্দ্রনাথ যদি কথ্যভাষাতেই সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব বলে মনে করেন তা হলে তাঁর অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বাদ পড়ে যায়।" এ ব্যাপারে মোহিতলাল নিরপেক্ষ যুক্তি অবতারণার নিষ্ঠা দেখিয়েছেন। অথচ প্রত্যেক সাহিত্যানুরাগীই জানেন রবীন্দ্র রচনার বিভিন্ন আলোচনায় মোহিতলাল কেমন জাতের বোদ্ধা ছিলেন। তিনি রবীন্দ্র প্রতিভাকে যতখানি শ্রদ্ধা করতেন **তার শতাংশ যদি তথাকথিত রবীন্দ্রভক্তদের থাকত তা-হলে রবীন্দ্র জয়ন্তীর মণ্ডপের চেয়ে রবীন্দ্রপাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটত।** নিন্দা-প্রশংসা নয়, ভক্তি-অনাদর নয়, স্তুতি-অপবাদ নয় যথার্থ অযথার্থের সত্যনির্ণয় সমালোচনার একমাত্র উপপাদ্য। ঠিকের সত্য এবং ভুলের সত্যটুকু সম্যক নির্দেশ করলে আনন্দ আর দূরে নয়।

কবিদের সঙ্গে সমালোচকদের যে সম্পর্ক তা বোধহয় খুব সম্প্রীতির নয়। সমালোচকদের ওপর বীতশ্রদ্ধ ভবভূতি যে উক্তি করেছিলেন সে উক্তিটি অন্ততঃ কালজয়ী হয়ে আছে।

সাম্প্রতিক কালেও রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিপক্ষ হিসেবে সমালোচকদের দেখেছেন এমন প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে নানা জায়গায় আছে। বিসর্জন নাটক তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে উৎসর্গ করার কালে তিনি এক জায়গায় বলেছেন,—তুমি ত আর সমালোচকদের মত নয় তোমার হয় ত ভাল লাগবে; সমালোচকদের ভাল লাগলেও নিস্তার নেই, তাঁরা বলবেন, "ভাল হত আরো ভাল হলে।" এই উক্তি রবীন্দ্রনাথের মত ক্ষমাশীল মানুষের মুখে অকারণে শোনা যায় নি, যদিও তিনি সমালোচনার মূল্য খুব উচ্চ বলে মানতেন' 'মংপুতে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের এক জায়গায় তাঁর সংলাপ :— "যথার্থ সমালোচনা, সেও এক পৃথক সাহিত্য, সেও সৃষ্টিকার্য, তার মূল্য কম নয়, কিন্তু তাই বলে যে, কবিতার রস পেতে গেলে পণ্ডিতের কাছে পাঠ নিতে হবে তার কোন মানে নেই।"

পাঠকদের সঙ্গে সমালোচকদের কোন সম্বন্ধ এতাবৎ ছিল না। বাঙলা সমালোচনা সাহিত্য যৌবনে উপনীত হয়েছে; তা যথার্থ সমালোচনায় পূর্ণ হয়ে এক পৃথক সাহিত্য গড়ে তুলুক। পরিণত অবস্থায় পোঁছানর কালে আমরা আশা করব পাঠকদের বিভ্রান্ত না ক'রে সমালোচনা সহিত্য যেন পরিপূরক হয়।

শঙ্কর গুপ্ত

মোহিতলালের ছন্দ

কবি মোহিতলাল মজুমদারের ছন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করার এই জন্যেই বিশেষ করে প্রয়োজন যে একাধারে তিনি কবি, ছান্দসিক এবং সমালোচক। অনেকেই জাত-কবি কিন্তু ছন্দ-বিজ্ঞানের তাঁরা ধার ধারেন না। আর জাত-কবি বলেই যথা সম্ভব প্রায়-নির্ভুল ছন্দের মাধ্যমে, খানিকটা অজ্ঞাতসারেই, তাঁরা লিরিকের সঙ্গীতময়তা বজায় রেখে কবিতা রচনা করে ফেলেন। আবার কেউ কেউ ছান্দসিক বা ছন্দ বৈজ্ঞানিক—ছন্দের চুল চেরা বিচার করে থাকেন তাঁরা। কিন্তু জীবনে এক লাইনও কবিতা লেখেন না বা লিখতে পারেন না— এমন কি চেষ্টা করলেও না। আবার কেউ কেউ ছন্দের এবং সামগ্রিক ভাবে কবিতার সমালোচনা করে থাকেন—এক কথায় যাঁদের আমরা বলে থাকি সমালোচক। কিন্তু একাধারে এই তিন গুণেরই অধিকারী, কৃতি ব্যক্তি, হাজারে এক জন চোখে পড়ে। ত্রিধারাসমন্বয়ের আধার, মোহিতলাল মজুমদার নিঃসন্দেহে সেই হাজারে 'এক-জন'-এর দলে পড়েন।

'মোহিতলালের ছন্দ' কথাটা খুব ব্যাপক। সুতরাং তাঁর সম্পূর্ণ কাব্য-রচনাবলীর ছন্দের বিচার করা প্রচুর সময় এবং পরিসর সাপেক্ষ। এই স্বল্প পরিসর আলোচনায় তেমন দুঃসাহসিকতার প্রশ্ন ওঠে না। মোহিতলালের কেবল মাত্র পয়ার সম্বন্ধেই এখানে আমরা আলোচনা করব। তবে সেই প্রসংগে অন্যান্য ছন্দেরও প্রাসংগিক আলোচনা অনিবার্য কারণে সংগত হতে পারে।

পয়ার জিনিষটা কি তা গোড়াতেই সংক্ষেপে এখানে একটু বলে নেওয়া দরকার। বাংলা কবিতা প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে পয়ারেরই জন্ম হয় সর্ব প্রথমে। আর সব চেয়ে পুরোনো বাংলা কাব্য-গ্রন্থ রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত এবং মঙ্গলকাব্য এ-সবই রচিত হয়েছিল পয়ারে। আর সেই প্রথম যুগ থেকে এপর্যন্ত সেই পয়ারই পরিমার্জিত ভাষায় এবং ইংরেজী কমা, সেমিকোলন ইত্যাদি অলংকারে অলংকৃত হয়ে বিচিত্র পদবিক্ষেপে আজ পর্যন্তও সমানে এগিয়ে এসেছে।

এমন কি তখনকার সেই দীর্ঘ ত্রিপদী ও বর্তমান কালের দীর্ঘ পয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। সমালোচকেরা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন যে মাইকেলের অমিত্রাক্ষর এবং এমন কি রবীন্দ্রনাথের সমিল-প্রবহমান ছন্দও নিছক পয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়! আধুনিক কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দও তাঁর শতকরা নিরানব্বুইটি কবিতাই এই পয়ারের মাধ্যমে রচনা করেছেন। জীবনানন্দের পরবর্তী কবিদের তো কথাই নেই! পয়ারে ছাড়া কথা বলবার অভ্যেসও যেন তাঁরা চুকিয়ে দিয়েছেন। এটা কিন্তু আমার মনে হয় খুবই আনন্দের এবং শুভ লক্ষণ। কারণ, বলতে গেলে, যে বাংলা ভাষার জন্মই হল পয়ারের মাধ্যমে সেই ভাষার তথা কবিতার চরম বিকাশের দিনেও দেখা গেল যে সেই একমাত্র পয়ারই তার প্রধান বাহন। সুতরাং পয়ারের সংগে বাংলা কাব্যের যোগসূত্র যে অচ্ছেদ্য তা বিনা তর্কে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

এখন এই পয়ারের প্রথম এবং চরম নমুনা হিসেবে খাড়া করা যেতে পারে—

মহাভারতের কথা / অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে / শুনে পুণ্যবান ॥

৮+৬=১৪ মাত্রা / (নিছক অক্ষর নয়) করে এর প্রতিটি লাইন। এই ভাবে চলল সুদীর্ঘকাল। তারপরে এর বিকাশ ঘটল কয়েক শতাব্দী পরে। হল হ্রস্ব পয়ার এবং দীর্ঘ পয়ার। হ্রস্ব পয়ার হল— বিছায়ে দিয়েছে ধরে/ধরে
৮+২=১০ মাত্রাকরে প্রতিটি লাইন। আর দীর্ঘ পয়ার হল বিভিন্ন আকারের। যেমন —

১। এখন রাতের শ্বণে / পৃথিবীর ক্লান্ত বুক জুড়ে
৮+১০=১৮ মাত্রা করে প্রতিটি লাইন। (আর এই শেষের ১০ মাত্রা কিন্তু তিন রকমের হতে পারে। যেমন ৬+৪=১০; ৪+৬=১০ এবং ২+২ +২+২+২=১০) তারপরে একে আরও দীর্ঘতর করা হল। যেমন —

২। খাণ্ডব দাহন যজ্ঞে / আমিতো কখনো হাতে / গাণ্ডীব ধরিনি!
৮+৮+৬=২২ মাত্রা করে প্রতিটি লাইন। তার পরে হল আরও বড়। যেমন —

৩। তোমাকে কোথাও ফেলে / নিঃসংগ চলেছি ফিরে / এসত্য বিশ্বাস করা দায়।
৮+৮+১০=২৬ মাত্রা করে প্রতিটি লাইন (আগের দিনে এই পয়ারকেই ভেঙে ভেঙে সাজিয়ে দিয়ে একে দীর্ঘ ত্রিপদী বলা হত)। তার পরের নমুনা হল —

৪। দীর্ঘ পথ ছুটে ছুটে / শেয়ালদা ষ্টেশানে এসে / সব শেষে গাড়ীথামে / অবসন্ন চাকা।
৮+৮+৮+৬=৩০ মাত্রা করে প্রতিটি লাইন। এবং সর্বশেষে দীর্ঘতম পয়ারের দাবী রাখতে পারে —

৫। সহস্র সলজ্জহাত / যাত্রাপথে বাধা দিয়ে / সমস্ত দিনটাকে দেয় / বিষিয়ে, সুতীব্র বিষ ঢেলে। ৮+৮+৮+১০=৩৪ মাত্রা করে প্রতিটি লাইন। তাহলে দেখা যাচ্ছে —এযাবৎ আমরা পয়ার পেয়েছি : আদি পয়ার এক প্রকার; হ্রস্ব পয়ার এক প্রকার; আর দীর্ঘ পয়ার পাঁচ প্রকার। মোট সাত প্রকার। ভবিষ্যতে আর পাওয়া যাবে কিনা জানি না।

পয়ারের এই পর্বের চালগুলো যদিও খুবই সহজ বলে মনে হয় কিন্তু অধিকাংশ কবিরাই এই সাধারণ নিয়মে ভুল করে ফেলেন।

প্রথমতঃ চরণের প্রথম পর্বে ৮ মাত্রা রাখতেই হবে। সেখানে অনেকেই ৪ কিংবা ৬ মাত্রা এনেই আবার ৬ কিংবা ৪ মাত্রা এনে ফেলেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে ২ কিংবা ৮ মাত্রাও এনে শেষ করতে দেখা গেছে।

পয়ার সব সময়ই ৮ মাত্রা দিয়ে আরম্ভ হবে এবং ২, ৬ কিংবা ১০ মাত্রা দিয়ে চরণ শেষ

করতে হবে। আবার ২, ৬ কিংবা ১০ মাত্রা আবার পরে কিন্তু আর কোনো মাত্রাই আনা চলবেনা। চরণকে দীর্ঘ করবার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে ৮ মাত্রার পর্ব। যে কটি খুশি পর পর ৮ মাত্রার পর্ব আনা যেতে পারে কিন্তু অন্য কোনো মাত্রার পর্ব আনলেই তার পরে চরণ শেষ করে দিতে হবে। তাই বলে কিন্তু ৮ মাত্রা শেষে রেখে চরণ শেষ করা চলবেনা— সেখানে প্রয়োজন হবে ওই ২, ৬ কিংবা ১০ মাত্রার পর্ব।

দ্বিতীয়তঃ পয়ারে কোনো শব্দের মাঝখানে ভেঙে পর্ব ভাগ করা চলবেনা। (অন্যান্য কিছু কিছু ছন্দে সেটা সম্ভব।)

তৃতীয়তঃ চরণের সর্বশেষ মাত্রার অক্ষরটিকে যুক্ত অক্ষর রাখলে চলবে না। মাঝখানে যে কোনো স্থানে যুক্ত অক্ষর থাকতে পারে। তবে সেই যুক্ত অক্ষরকে এক মাত্রা ধরতে হবে (অন্য-ছন্দের বেলায় এনিয়মের ব্যতিক্রম আছে) যে কারণে আধুনিক কবিরা অনেক সময় হসন্ত বর্ণকে আলাদা মাত্রার মর্যাদা দেন না। যেমন—

উনত্রিশে কার্তিক্‌কে আমি / আট্‌কে রাখ্‌বো তোমারি খাঁচায়।

এটি এযুগের নিছক ৮+১০=১৮ মাত্রার পয়ার। এপর্যন্ত কোনো আধুনিক কবি এটিকে বিশ্লেষণ করে দেননি বলে অনেক সময় এই সব লাইন পড়তে গিয়ে পাঠকদের হোঁচট খেতে হয়। আবার এই আধুনিক কবিদের মধ্যেই অনেকে সংযুক্ত অক্ষরকে পয়ারেও দুই মাত্রা হিসেবে ধরে ভুল করে থাকেন। যেমন —

শুদ্ধ সমাজ বোধ / ঘটেনি এখনো, তাই আজ (৮+১০) এখানে ‘শুদ্ধ’কে তিন মাত্রা ধরা যায়না কারণ যদি বলা হয় বিশুদ্ধ সমাজ বোধ তাহলেই কানের ধর্ম এবং পয়ারের ধর্ম বজায় থাকে।

পয়ার সম্বন্ধে মোটামুটি এইটুকু ধারণা থাকলেই কবি এবং পাঠক— এমন কি ছাত্রদের পক্ষেও যথেষ্ট।

এবারে আমাদের আলোচ্য বিষয় বস্তুতে আসা যাক্। “বাংলা কবিতার ছন্দ” গ্রন্থের গোড়াতেই মোহিতলাল বাংলা ছন্দকে দুটি ভাগে ভাগ করে দেখিয়েছেন। একটি পয়ার-জাতীয় ছন্দ, অপরটি রবীন্দ্রীয়-গীতিচ্ছন্দ। এবং মোহিতলালের ভাষায়— “পয়ারের আসল রূপ— তার সেই মাত্রা পরিমাণ (১৪),এবং পদ ভাগ (৮+৬)।”

আবার অন্যত্র বলেছেন— “সনেটে চৌদ্দটি এক ছন্দের পংক্তি থাকে— ইংরেজীতে Jambic Pentameter —ছন্দই সনেটের ছন্দ; বাংলাতে ও তাহার অনুরূপ চৌদ্দ-অক্ষরের পয়ারই প্রশস্ত; **কখনো বা ঐ ছন্দকেই একটু দীর্ঘ করিয়া লওয়া হয়,** তাহাতে ছন্দের সঙ্গীতগুণ বৃদ্ধি পায়— কিন্তু সনেটের সংহতি-গুণ ক্ষুণ্ণ হয়। বাংলায় ঐ পয়ার-পংক্তিই যে সনেটের বিশেষ উপযোগী, তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু দীর্ঘ পয়ারেও (১৮ অক্ষর) সনেটের ছন্দধ্বনি একটু গভীর ও গম্ভীর হইবার অবকাশ পায় বলিয়া, তেমন ছন্দও বাংলা সনেটে গ্রাহ্য হইয়াছে।”

আরও এক স্থানে তিনি এই পয়ার সম্বন্ধেই বলেছেন— “পদভূমক (পয়ার) ছন্দের বিভিন্ন ছাঁদ (চাল বা চলন) অনুসারে এই পদান্ত যদি ৮+৬ এবং ৮+১০ প্রভৃতির মত হইয়া থাকে।”

এক্ষেত্রে মোহিতলালের সংগে আমরা সকলেই একমত। গোড়াতেই বলেছি—মোহিতলাল কবি, সমালোচক-কবি। এক কথায় ছান্দসিক-সমালোচক-কবি। এবং তাঁর পয়ারের বিচারে তাঁর নিজের মতামত গুলোকেই মেনে নিয়ে, এমন কি উদ্ধৃত করে দিয়ে, দেখানো যাবে যে তাঁর অধিকাংশ কবিতার পয়ারেই ছন্দের গরমিল হয়েছে; পর্বের (তাঁর মতে পদের) চালে ভুল হয়েছে— এমন কি জায়গায় জায়গায় ছন্দ পতনও হয়েছে।

এতে কিন্তু এটাও প্রমাণিত হয় যে তিনি নিজে ছন্দ সম্বন্ধে যে আইনের কথা উল্লেখ করেছেন নিজেই আবার সেই আইন ভঙ্গ করেছেন। আর এই আইন ভঙ্গকে যদি অন্যায় না বলে ‘আর্ষপ্রয়োগ’ বলা হয় তাহলে তিনি নিজেই বা অন্যান্য আর্ষ-প্রয়োগকারীদের কি করে বলেছেন— “আধুনিক যুগের মহাকবি হেমচন্দ্রেও, শুধু ছন্দ নয়— মিল সম্বন্ধেও যে তাচ্ছিল্য দেখা যায়, তাহা শিক্ষিত বাঙালী কবি ও তাঁহার ভক্ত পাঠকগণের পক্ষে নিতান্তই লজ্জাকর।” অথচ নিজের তাচ্ছিল্যের প্রতি তিনি একেবারেই উদাসীন। অন্যত্র তিনি বাঙ্গালী পাঠক এবং কবিদের উল্লেখ করে বলেছেন—” আমরা জানি যে, কান মলিয়া দিলেও যদি কাহারও ছন্দবোধ জন্মিত, তবে **এ জাতির** কান ছিঁড়িয়া যাইত তথাপি ছন্দ বোধ জন্মিত না।” অথচ আশ্চর্য! আজ পর্যন্ত আমাদের বাংলা সাহিত্যের জ্যাঠামশাইরা কিংবা বড়দারা এর একটা প্রতিবাদ করতেও সাহস পাননি!

আমার মতে, মোহিতলাল নিজে পয়ারের নিয়ম-কানুন জানলেও খাঁটি পয়ার লিখতে জানতেননা— যদি জানতেন তা হলে নিজের লেখা অধিকাংশ পয়ার চালের ভুল করে গোঁজা মিল দিতেন না। এই গোঁজা মিল কি? তাঁর ভাষাতেই আগে এখানে বলে নিচ্ছি! চৌদ্দ মাত্রার (৮+৬=১৪) পয়ার বুঝাতে গিয়ে তিনি সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়েছেন —

“নিখিল আকাশ ভরা / আলোর মহিমা।”

আর মোহিতলালের মতে—“ ইহা একটি আধুনিক পয়ারের চরণ। প্রথম পদটি (আমাদের মতে প্রথম পর্বটি) ৮ মাত্রার এবং দ্বিতীয় পদটি ৬ মাত্রার। এই চৌদ্দ মাত্রার চরণে ৮+৬-এর স্থানে ৬+৮ হইলে ছন্দই ভিন্নরূপ ধারণ করিত। নিখিল আকাশ ভরা আলোর মহিমা’ এই চরণটিকে যদি ৬+৮ করিয়া লওয়া যায়, যথা —

আলোর মোহিমা / নিখিল আকাশ ভরা

অমনি উহা খাঁটি ত্রৈমাত্রিক পর্বভূমক ছন্দ হইয়া দাঁড়ায়— ছন্দের ঠাট বদলাইয়া যায়, পয়ারছন্দ গীতিচ্ছন্দে পরিণত হয়।

আর ঠিক এই ভুলটিই তিনি করেছেন সারা জীবন। অন্য ভুলও যে না করেছেন তা নয় তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এই ভুল।

এখানে আর একটি কথা বলে নেওয়া দরকার। তাঁর মতে “৮+৬-এর স্থানে ৬+৮ হলেই পয়ার ছন্দ গীতিছন্দে পরিণত হয়।” কিন্তু এটিও তাঁর পুরোপুরি নির্ভুল ধারণা নয়। কারণ তিনি যাকে ৬+৮ বলেছেন তা আসলে ৬+৮ নয়। ৬+৬+২, যথা —

আলোর মহিমা / নিখিল আকাশ ভরা

সে যা হোক, ৮+৬=১৪ এবং ৮+১০=১৮ এই দ্বিবিধ মাত্রার ছন্দে কোথায় তিনি খিচুরী চাল ঢেলে গোঁজামিল দিয়েছেন তা আমরা তাঁর বিভিন্ন কবিতা থেকে পর পর এক এক জোড়া করে চরণ (লাইন) তুলে দিয়ে, পদ বা পর্ব ভাগ করে, ভুল গুলো দেখিয়ে দিচ্ছি।

১। ৮+৬=১৪ মাত্রার পয়ার :

(ক) ॥ বিরহ মঙ্গল ॥

সিন্দুর দানিবে যবে / যত্নে অপসারি' (৮+৬=১৪)
মুখাব গুণ্ঠন, কুমারীর কালোকেশে। (৬+৮=১৪ ?)

এখানে দ্বিতীয় লাইনে ৮+৬ মাত্রা হয়নি। এমনকি গীতিচ্ছন্দের কিংবা ছড়ার-ছন্দের ৬+৬+২ মাত্রাও হয়নি। (হলেও তো পয়ারের জাত যেত, ভুলই হত) কারণ গীতিচ্ছন্দে বা ছড়ার ছন্দে ‘মুখাব গুণ্ঠন’ এ পরের ‘কুমারীর কালো’ এর চেয়ে পুরো এক মাত্রা বেশী আছে। সুতরাং

এটা যে কোন ছন্দ হয়েছে তা আমাদের বোধগম্যের বাইরে। কেউ কেউ হয়তো বলবেন—কেন, গুনে গুনে ৮ মাত্রার পরে যতি টেনে দাওনা? কিন্তু তাহলে তো আরও চমৎকার হয়:

মুখাব গুন্ঠন, কুমা / রীর কালো কেশে

এরূপ ভাগ করলে কবিতার অন্তরের ভাব আর বাইরের সৌন্দর্য (কানের ধর্ম বাদ থাক) দুই-ই মাঠে মারা যায়। তাছাড়া আজ পর্যন্ত কোনো ছান্দসিকই (মোহিতলাল নিজেও) পয়ার ছন্দে শব্দকে এভাবে ভেঙ্গে ছন্দ-বিশ্লেষণ (Scansion) করতে সাহস পাননি। আর যেখানে খুশি সেখানেই যদি শব্দকে ভেঙ্গে যতি টানা যায় তাহলে তো পর পর চৌদ্দটি অক্ষর (মাত্রা) সাজিয়ে দিয়ে তাকে পয়ার অথবা যাহোক একটা নাম দিয়ে একই ছন্দবলে সবগুলোকে চালিয়ে দেওয়া যেতো। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়!

এখানে উদাহরণ স্বরূপ চারটি চৌদ্দ মাত্রার অধিকারী সেই হেতু এরা প্রত্যেকেই একই ছন্দের কিংবা পয়ারের অন্তর্গত? কিন্তু আসলে তো তা নয়!

বিষের জ্বালায় জ্বলি / মৃত্যুনদী কূলে (৮+৬=১৪)
তোমার কাছে / অভয় নিতে / এসে দেখি (৫+৫+৪=১৪)
বিজলী মেঘে-মেঘে / নেমেছে আঁধিয়ার ((৭+৭=১৪)
কটির বসন / কখন যে গেছে / খুলে (৬+৬+২=১৪)

প্রতিটি চরণে মোট ১৪টি করে মাত্রা রয়েছে বলেই তো আর এদর একই ছন্দ বা পয়ার বলা হবেনা। সুতরাং পয়ারের নিয়মের ক্ষেত্রে এধরণের ব্যতিক্রম ঘটলে তাকে 'ভুল হয়েছে' বলবার সৎসাহস না থাকলেও 'ছন্দে গোঁজা মিল দেওয়া হয়েছে' এটুকু অন্তত বলা উচিৎ।

(খ) ॥ দ্রোপদী (১) ॥
দূর হতে তুমি তারে / তর্জ্জনী সঞ্চালি
করেছ বিদায়। বীরের সহধর্মিনী (৬+৫+৩=১৪?)

(গ) ॥ কবির প্রেম ॥
মূর্তিমান পুণ্য যেন / পরাইত বুকে (৮+৬=১৪)
বৈকুন্ঠের কৌস্তভরতন!—মিথ্যা নয়। (৪+৬+৪=১৪?)

(ঘ) ॥ এক আকাশ (১) ॥
কোথা হতে এই সূর্য / চন্দ্রাতপ তলে (৮+৬=১৪)
আসিনু কেমনে?—প্রাণের পাথেয় হীন। (৬+৬+২=১৪)

(ঙ) ॥ স্বপ্ন সঙ্গিনী (১) ॥
লভেছিনু ওই তব / কর বিলম্বিনী (৮+৬=১৪?)
স্বয়ম্বর মালা; কি রহস্য কব কারে? (৬+৪+৪=১৪?)

এখানে ৮+৬=১৪ চরণগুলো ছাড়া বাকী প্রত্যেকটি চরণেরই চালে ভুল হয়েছে।

২। ৮+১০=১৮ মাত্রার পয়ার। এক্ষেত্রেও ৮ এবং ১০ যতি ঠিক না রেখে পর পর ১৮ মাত্রা সাজিয়ে দিলে যদি তাকে যে কোনো একই ছন্দ বলে কিংবা পয়ার বলে অভিহিত করা যেত তাহলে নিচের এই চারটি লাইনকে নিশ্চয়ই একই ছন্দের অন্তর্গত বলে দাবী করা যেত। কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব। যেমন—

খুটের নৈবেদ্য বঁধু, / নিবেদন করো মানসীকে (৮+১০=১৮)
টিকে আছে আজো / মানুষ—এটাই / ভয়ানক ভুল (৬+৬+৬=১৮)

পৃথিবী বড় বেশী গোল: / মানুষ পশুদের জ্ঞাতি (৯+৯=১৮)
কুড়োবে উড়োখই / মানসী নিজে আর / সে তোমায় (৭+৭+৪=১৮)

মোট মাত্রাসংখ্যা এদের ১৮ হলেও একই ছন্দের অন্তর্গত এরা নয়। অথচ ১৮ মাত্রার পয়ারেও মোহিতলাল ঠিক সেই একই ভুল করেছেন।

(ক) ॥ আবাহন ॥
কান্ডরী বলিয়া কারে / তর-ঘাটে মিনতি জানাও (৮+১০=১৮)
সব মরা! শকুনি-গৃধিনি হের ঘেরিয়া সবার (৪+৬+৮=১৮?)

(খ) ॥ বঙ্কিমচন্দ্র (২) ॥
শাস্ত্র বালুকার বাঁধে / মন্ত্রে-তন্ত্রে শুকাইল শেষে (৮+১০=১৮)
প্রাণের সে প্রীতি সহজিয়া; এমন মাটির দেশে (১০+৬+২=১৮?)

(গ) ॥ শরৎচন্দ্র (২) ॥
ধূলায় ধূসর যেই / পড়েছিল প্রাণের ভুখারি (৮+১০=১৮)
একপাশে অজ্ঞাত অখ্যাত সেই বাণীর পূজারী (৪+৮+৬=১৮?)

(ঘ) ॥ রূপার্টব্রুক (৫) ॥
প্রাণ মন্ত্রে দীক্ষা দিলে / মরণের বরযাত্রী তুমি (৮+১০=১৮)
হেগাণ্ডিবী, বিস্ফারি বিশাল বক্ষ করিলে যোজনা (৪+৮+৬=১৮?)

(ঙ) ॥ বন্ধু ॥
না, না, এসো, সফল চাতুরী ছল দূরে পরিহার (৪+৮+৬=১৮).
তোমার স্বরূপ রূপ / প্রাণসখা! শ্মশান-ঈশ্বরী ৮+১০=১৮)

(চ) ॥ অন্ধকার ॥
স্বচ্ছ হিম-জাল ভেদি / দেখা দিল কত নভচর (৮+১০=১৮?)
অন্তরীক্ষে—জ্যোতির জনতা সেকি নিশুম্ধ সুন্দর ((৪+৬+৮=১৮?)

আমার বক্তব্যের স্বপক্ষে এতগুলো উদাহরণই কি যথেষ্ট নয়? এখানেও দেখা গেল ৮+১০=১৮ চরণগুলো ছাড়া বাকী প্রত্যেকটি চরণেই তিনি সেই চালের ভুল করেছেন।

ছন্দে এই ভুল চাল কিংবা গোঁজা মিল হেমচন্দ্র কিংবা নজরুল অথবা জীবনানন্দ কিংবা বিষ্ণুদের কবিতায় কিছু কিছু থেকে থাকলেও তা নিয়ে আলোচনা করার তেমন প্রয়োজন হয়তো নেই কারণ তাঁরা নিছক কবি। ছান্দসিক নন। কিন্তু মোহিতলালের বেলায় ছন্দ সম্বন্ধে তাঁর এই গাফিলতি প্রসন্নচিত্তে মেনে নেওয়া যায়না।

প্রফুল্লকুমার দত্ত

সমালোচনা

বুদ্ধিজীবী, বিপ্লব ও ফরাসীদেশ

উনবিংশ শতাব্দীতে রুশদেশে স্বদেশের শ্রেণী-ঐতিহ্য বিচ্যুত, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যখন বুদ্ধিজীবী হিসাবে আখ্যাত হয়েছিলেন, তখন তাঁরা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি যে, পৃথিবীর সবদেশেই একদল ব্যক্তি দেখা যাবে, যাঁরা একদিন বুদ্ধিজীবী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতে গৌরববোধ করবেন। সর্বত্রই রাজনৈতিক দলগুলি তাদের বক্তব্যকে সাধারণলোকের নিকট মতবাদরূপে উপস্থিত করবার জন্য এঁদেরই স্মরণাপন্ন হয়ে থাকেন। তবে বুদ্ধিজীবীদের মানসিক-গঠন সবদেশে এক নয়, সমাজে প্রভাব ও দেশভেদে বিভিন্ন। যেমন ইংলণ্ডে শ্রেণী হিসাবে বুদ্ধিজীবীদের প্রভাব খুব বেশী নয়, রাজনৈতিক নেতারাই প্রভাবশালী (অবশ্য ইংলণ্ডে বুদ্ধিজীবীরাই সাধারণতঃ রাজনৈতিকদলের নেতা হয়ে থাকেন)। আবার আমেরিকায় বিশেষজ্ঞদের প্রভাব অসামান্য। কিন্তু ফরাসীদেশে বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক প্রতিপত্তি সবচেয়ে বেশী। কোন বিষয়ে প্রকাশ্যে অজ্ঞতা স্বীকার করেও কোন বুদ্ধিজীবী সেই বিষয়ে বক্তৃতা করতে চাইলে যে পরিমাণ জনসমাবেশ হবে, একজন প্রথমশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা তা কল্পনাই করতে পারেন না।

যে ফরাসীদেশে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিপত্তি অসামান্য, যে দেশ সারা পৃথিবীকে সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার বাণী শুনিয়েছিল, সেই দেশে বার বার একনায়কত্ব বরণ আমাদের শুধু বিস্মিত করে না, দুঃখিতও করে। ফরাসীদেশের ঘটনাবলী নানাজনে নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চাইলেও ঐ দেশের ঘটনাবলী আজও অধিকাংশ ব্যক্তির নিকট বিস্ময়ের বস্তু। কারণ ঐ সমস্ত ব্যাখ্যাতো ফরাসীদেশ ও সমাজের আংশিক বর্ণনামাত্র! সুখের বিষয় দুইজন নেতৃস্থানীয় ফরাসী বুদ্ধিজীবী লুতি এবং আরোঁ একই সময়ে ফরাসীদেশের সামগ্রিক পরিচয় দিতে সচেষ্ট হয়ে দুইখানা গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। রেমোঁ আরোঁর পুস্তকের উপলক্ষ্য ফরাসী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী।* কান টানলে যেমন মাথা আসে, তেমনি বুদ্ধিজীবীদের কথা বলতে গেলেই সে দেশের সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক কাঠামো এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক ধ্যানধারণা স্বভাবতঃই এসে পড়ে। আরোঁর পুস্তকেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি।

ফরাসীদেশে বার বার বিপ্লব হয়েছে এবং তারপরেই একনায়কত্ব জনসমর্থনে ক্ষমতালাভ করেছে। এর কারণ এই নয় যে, যে বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করেছিল, তারা রাতারাতি একনায়কত্বে বিশ্বাসী হয়ে পড়েছিল। লেখকের মতে, ফরাসীদেশের দ্রুত পটপরিবর্তনের কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে ঐ দেশের সমাজব্যবস্থার মধ্যে। বার বার বিপ্লব হলেও, ফরাসীদেশে গণতন্ত্রের ভিত্তি আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। ফরাসীদেশে প্রায় বিনাবাধাতেই সবাই ক্ষমতালাভ করায় প্রতিপক্ষের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য নিজেদের শক্তি সংহত করবার প্রয়োজন কখনও দেখা দেয় নি। ১৭৮৯ সালে বিপ্লবীরা রাজশক্তির কাছ থেকে বিনাবাধায় ক্ষমতালাভ করায় ১৮৭০ সালের পূর্বে এমনকোন সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি, যে সরকার অধিকাংশ ফরাসীবাসীর সমর্থন অর্জনে সক্ষম হয়েছিল।

প্রতিপক্ষের কাছ থেকে বাধা না পাওয়ায় বিরোধীদলগুলি নিজেদের শক্তি সংহত করতে অক্ষম হওয়ায় গোটা উনবিংশ শতাব্দীটাই বামপন্থীরা ফ্রান্সের স্থায়ী বিরোধীদলের ভূমিকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল এবং বার বার সুযোগ আসা সত্বেও তা গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। কারণ আমাদের দেশের মত ফরাসীদেশেও বামপন্থীরা কোনদিন এক হতে পারে নি। আমাদের দেশের মত ফরাসী দেশেও অসংখ্য দল ও গ্রুপের মিলিত নাম 'বামপন্থী'। এরা প্রত্যেকেই স্ব স্ব দলের কার্যক্রমের প্রতি এত বেশী বিশ্বস্ত যে, বৃহত্তর স্বার্থের জন্য নিজেদের মধ্যে মিলনের ভিত্তিকে কখনও প্রশস্ত করতে পারেনি এবং এখনও পারে না। ফরাসী দেশের ইতিহাস এই বামপন্থীদের ব্যর্থতার ইতিহাস বললেও অত্যুক্তি হয় না। বামপন্থীদলের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বিপ্লবের পরে অসন্তুষ্ট জনসাধারণ বার বার একনায়কত্ব বরণ করেছে এবং প্রতিবারই গণতন্ত্র রক্ষার নামে একনায়কত্ব ক্ষমতায় আরোহন করেই রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে ফরাসীদেশ থেকে বিদায় নিতে বাধ্য করেছে। শুধু ফরাসী দেশ নয়, রাশিয়া, জার্মানী, মিশর, চীন, পাকিস্থান, সুদান— সর্বত্র একই জিনিষ লক্ষ্য করা যাবে। গণতন্ত্রের আদর্শ ফ্রান্সের সামাজিক আদর্শে রূপান্তরিত না হওয়ায় অন্য একটি কারণও আরোঁ উল্লেখ করেছেন। জনগণের সার্বভৌমত্ব, শাসনতান্ত্রিক অধিকার, নির্বাচিত এবং সার্বভৌম আইন পরিষদ এবং সম-অধিকারের দাবীতেই ফরাসী বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং একমাত্র বিরোধীদলগুলিই দাবীর জন্য সর্বদা সংগ্রাম করেছিল। কিন্তু ইংলণ্ডে এই অধিকারগুলি অর্জনের জন্য রক্তপাত ঘটেনি। এই অধিকারগুলি জনগণের করায়ত্ত হওয়ার কৃতিত্ব কোন একটি দলের নয়, দুটি দলেরই। দুটি দলের প্রচেষ্টাতেই এই আদর্শগুলি ইংলণ্ডের সামাজিক আদর্শে রূপান্তরিত হয়েছে। অবশ্য দুই দেশের রাজনৈতিক দলের কার্যকলাপ দুটি দেশের সামাজিক মূল্যবোধের বিভিন্নতার একমাত্র কারণ নয়। গণতান্ত্রিক চেতনা ফরাসীদেশে সামাজিক মূল্যবোধে রূপান্তরিত না হওয়ার কারণ খুঁজতে হবে রিফরমেশান আন্দোলনের ব্যর্থতার মধ্যে। ইউরোপের যে দেশগুলিতে রিফরমেশান আন্দোলন ব্যর্থতা অর্জন করেছে, সেই দেশগুলিতেই গণতন্ত্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত দেশগুলিতে খৃষ্টের বাণী মানবতাবাদ, সামাজিক সংস্কার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিরোধ করতে সচেষ্ট হয় নি। ইংলণ্ডেও দেখা যায়, রাজশক্তির স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে চার্চ অসংখ্যবার প্রধানতম ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ধর্মই একদা ইংলণ্ডের প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লবকে সফল করেছিল। কিন্তু ফ্রান্স ইটালী ও স্পেন ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক আন্দোলন সত্বেও গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র বিশ্বাসীরা চার্চকে শত্রু হিসাবে জ্ঞান করে থাকেন। রিফরমেশান আন্দোলনের ব্যর্থতাই এই দেশগুলির সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গীকে ভিন্ন করেছে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে রিফরমেশান আন্দোলন এবং বিপ্লবের যুগপৎ সাফল্য চার্চ ও শাসকশ্রেণীকে ইংরেজবুদ্ধিজীবীদের চিরকালীন শত্রু হিসাবে মনে করবার কোন কারণ দেখা দেয় নি।

প্রশ্ন উঠতে পারে, বর্তমান ফরাসীদেশে বুদ্ধিজীবীদের প্রতিপত্তি ও রাজনীতি মুখীনতা সত্বেও ফরাসীদেশে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন সম্ভব হচ্ছে না কেন? প্রথমতঃ, ফরাসীদেশে একে অপরের কাছ থেকে কিছু শিখতে চায় না। সমাজে নূতন চিন্তাধারাকে প্রবাহিত করবার কোন সুযোগ নাকি ফরাসীদেশে নেই। বিশেষজ্ঞ, বুদ্ধিজীবী ও বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সমাজের অপরাপর অংশের সংযোগ যেমন ইংলণ্ড ও আমেরিকায় আছে ফরাসীদেশে নাকি তা অনুপস্থিত। শুনতে অবিশ্বাস্য মনে হলেও, বুদ্ধিজীবীদের রাজনৈতিক সচেতনতাও ফরাসী-

---

* The opium of the Intelletuals: Raymond Aron (Secker & Warburg, 35s.)

দেশে দুর্গতির অন্যতম কারণ। বুদ্ধিজীবীরা সাধারণতঃ কোন উচ্চতর আদর্শের প্রেরণায় রাজনীতিতে যোগদান করেন না এবং অন্যান্যক্ষেত্রে তাঁদের চিন্তাধারা যুক্তি নির্ভর হলেও, রাজনৈতিক বিষয়ে অধিকাংশ সময়েই গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাস দ্বারা তাঁরা চালিত হন। সম্প্রতি ডি, কে, আর, ভি, রায়ও বৈজ্ঞানিকদের অ-বিজ্ঞান বিষয়ে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভিযোগে বৈজ্ঞানিকদের অভিযুক্ত করেছেন। বুদ্ধিজীবীরা কেন রাজনীতিতে যোগদান করেন এবং সে রাজনীতি সাধারণতঃ কেন গঠনমূলক হয়না, আরো তার কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন। প্রথমতঃ সবদেশেই দক্ষ কারিগরদের অপেক্ষা অধ্যাপক সাহিত্যিক, দার্শনিক প্রভৃতি অনেক কম বেতন পেয়ে থাকেন। নিকৃষ্টতর কার্যে রত ব্যক্তির অতিরিক্ত বেতনলাভ যে সমাজে সম্ভব হচ্ছে, বুদ্ধিজীবীরা স্বভাবতঃই সেই সমাজের প্রতি বিরূপ হন। দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধিজীবীরা নিজেদের সম্পর্কে উচ্চধারণা পোষণ করায় বিশ্বাস করেন যে, যে সমাজে তাঁদের প্রতিভার মূল্য অস্বীকৃত, সেই সমাজের অবসানের জন্য তাদের সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু উন্নততর সমাজ-প্রতিষ্ঠার জন্যে যে পরিমাণ ধৈর্য্য ও অধ্যাবসায় প্রয়োজন, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে তা একেবারেই অনুপস্থিত। সমাজের প্রতি বিরূপতা বশতঃ নিজেদের মনেই একটি কল্পনারাজ্যের সৃষ্টি করে সেই সমাজের স্বপ্নে বুদ্ধিজীবীরা মশগুল থাকেন এবং বর্তমান সমাজের অবসানের জন্য 'শর্টকাট' খুঁজতে গিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনের শরিক হন। ইংলণ্ড ও স্কাণ্ডেনেভিয়ার বিরাট পরিবর্তন ফরাসী বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। গৃহযুদ্ধ, দমনমূলক কৃষিনীতি, ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও সোভিয়েত রাশিয়া তাঁদের আদর্শ। সমাজের প্রতি বিতৃষ্ণার জন্যে ফরাসী সমাজ ও শাসনব্যবস্থা সংশোধনে আত্মনিয়োগের কথা ফরাসী বুদ্ধিজীবীরা ভাবতেই পারেন না। প্রসঙ্গতঃ একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অসন্তোষ বা সমাজ প্রগতির আকাঙ্ক্ষা কোন দেশকে বিপ্লবের দিকে নিয়ে যায় না। বিপ্লবের প্রাথমিক সর্ত হল বিপ্লবীরা অপরিমিত আশা ও অধৈর্যের অধিকারী হবে। পৃথিবীর প্রতি তাদের ঘৃণা এত বেশী পুঞ্জীভূত হবে যে, ধ্বংসের যে কোন প্রচেষ্টাই তাদের কাছে বরণীয় মনে হবে। এই বিশেষভাব বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে থাকে বলেই ফরাসী-বুদ্ধিজীবীরা যখন রোজেনবার্গের বিচারকে প্রহসন আখ্যা দেন, তখন সোভিয়েত রাশিয়ার পার্জ ও হত্যাকাণ্ড অথবা ফরাসী দেশের গণআদালতের বর্বরতা সম্পর্কে নীরব থাকেন। ফরাসী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী লেখকের উপজীব্য হলেও, বিভিন্নদেশের বুদ্ধিজীবী ও তাঁদের মানসিক গঠন, অন্যান্য দেশের সামাজিক সংগঠন সম্পর্কে লেখক সহানুভূতির দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন। লেখকের মন্তব্যসহ বিখ্যাত সার্ত্র-কেমু বিতর্ক একটি অধ্যায় অধিকার করেছে। বর্তমান পুস্তকটি পড়বার পর ফরাসী দেশে দ্য-গলের ক্ষমতারোহন আর অস্বাভাবিক মনে হবে না এবং ফরাসীদেশের চিন্তারাজ্যে অরাজক অবস্থা পড়বার সময় নিজের অজ্ঞাতসারে ভারতবর্ষের কথা স্বাভাবিকভাবেই মনে আসে। ভারতবর্ষেও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সামাজিক মূল্যবোধে রূপান্তরিত না হলে, ফরাসীদেশের ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি এদেশে কি ঠেকানো যাবে? লেখকের বক্তব্যের সঙ্গে সকলে একমত না হলেও এবই প্রত্যকের চিন্তার খোরাক জোগাবে। এমন একটি বই রচনার সময়ে লেখক তাঁর বক্তব্য ভালভাবে গুছিয়ে বলবার দিকে যে কোন দৃষ্টি দেন নি, ভাবতে অবাক লাগে। অভিযোগও জমা হয় লেখকের বিরুদ্ধে। অনুবাদক যে দায়ী নয়, তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

নিরঞ্জন হালদার

ডক্‌টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরীর বহু সংস্কৃত সঙ্গীত সম্বলিত সংস্কৃত নাটকাবলী ॥

১। **ভক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়ম্‌।** মহাপ্রভুর লীলাসঙ্গিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনচরিত অবলম্বনে রচিত। সুবিস্তৃত বাংলা ভূমিকায় গবেষণালব্ধ বহু অভিনব তথ্য পরিবেশন করা হইয়াছে। মূল্য মাত্র দেড় টাকা।

২। **মহাপ্রভু-হরিদাসম্‌।** শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর পরিপ্রেক্ষিতে ঠাকুর হরিদাসের পুণ্য জীবনী অবলম্বনে রচিত। ঠাকুর হরিদাস সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয় বিস্তৃত বাংলা ভূমিকায় পর্যালোচিত হইয়াছে। মূল্য মাত্র আড়াই টাকা।

৩। **নিষ্কিঞ্চন-যশোধরম্‌।** ভগবান বুদ্ধের লীলাসঙ্গিনী যশোধরা — গোপার জীবনী অবলম্বনে লিখিত। বিশ্বের সমগ্র বৌদ্ধ পুস্তকাগারে সংরক্ষিত মুদ্রিত ও অমুদ্রিত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত উপকরণ অবলম্বনে রচিত। মূল্য মাত্র তিন টাকা।

প্রাপ্তিস্থান
প্রাচ্যবাণী মন্দির
৩, ফেডারেল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

সমকালীন

নিয়মাবলী

গ্রাহকগণের প্রতি :

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা, সডাক ষান্মাসিক তিন টাকা চার আনা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

লেখকের প্রতি :

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। রচনা কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া পাঠানো দরকার। ঠিকানা লেখা ডাকটিকিট দেওয়া লেফাফা থাকলে অমনোনীত গল্প ও প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠানো হয়, **কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না।** দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়।

প্রকাশকদের প্রতি :

'সমকালীনের' গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও কাব্য গ্রন্থের বিস্তারিত নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুইখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

সমকালীন ॥ ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য
ফোন : ২৩-৫১৫৫